নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮১

পঞ্চাশ পয়সা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

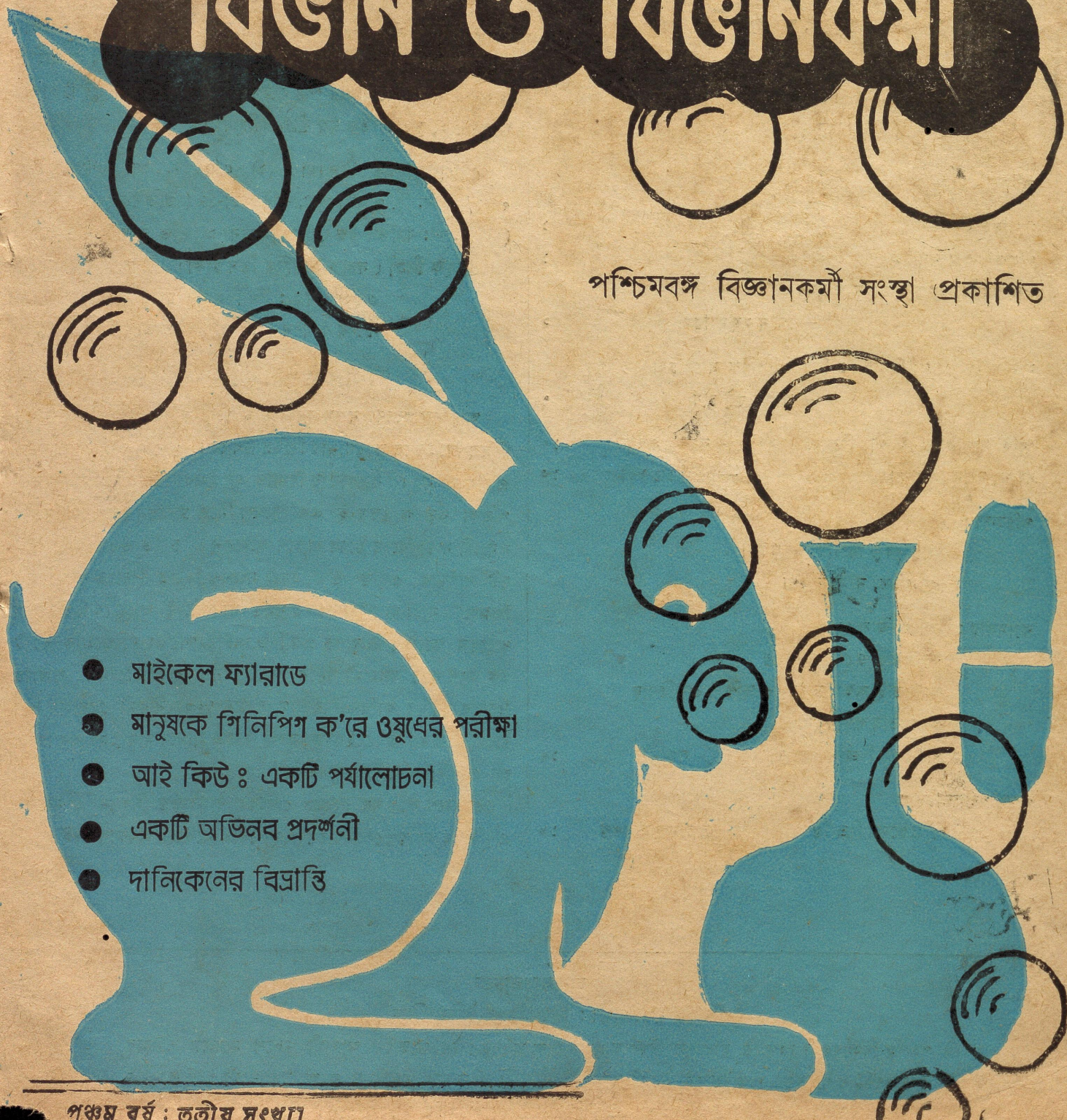

- মাইকেল ফ্যারাডে
- মানুষকে গিনিপিগ ক'রে ওষুধের পরীক্ষা
- আই কিউ ঃ একটি পর্যালোচনা
- একটি অভিনব প্রদর্শনী
- দানিকেনের বিভ্রান্তি

পঞ্চম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

নভেম্বর-ডিসেম্বর— ১৯৮১

পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

সূচী

সম্পাদকীয় ১

পত্রিকা সম্পর্কে পাঠক ১

মাইকেল ফ্যারাডে : জীবন ও সময়
—রবীন মজুমদার ২

মানবদেহে পরীক্ষা-নিরীক্ষা : কিছু প্রাসংগিক আলোচনা
—সুখময় ভট্টাচার্য ৭

'বুদ্ধি' সম্পর্কিত কিম্বদন্তীর বিরুদ্ধে —কল্যাণ গুহ ১০

যে না মানে সে গাধা —রবীন চক্রবর্তী ১৩

পরিক্রমা :
আর একটি রিয়্যাকটর দুর্ঘটনা
বিদ্যুৎচিত্র, নানান তথ্য

ক্যানসার : কবিরাজি দাওয়াই
ক্যানসার ও হোমিওপ্যাথি
কার্বনডাই অক্সাইড দূষণ ও পশ্চিমী প্রকৃতিবাদ
কলকাতার শব্দদূষণ বাড়ছে
আরেকটি বিজ্ঞান পদযাত্রা —সন্ধানী ১৪

পুস্তক পর্য্যালোচনা :
দাবিকেনের বিভ্রান্তি —ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ১৬

লেখা চাই ।। বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োগ, বিজ্ঞানকর্মীদের সমস্যা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে রচনা সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে আহ্বান করা হচ্ছে। কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার হরফে অনধিক ২০০০ শব্দের মধ্যে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়। কলকাতার বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের লেখা পেতে আমরা বিশেষভাবে আগ্রহী। লেখকের নাম ও ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ অবশ্যই থাকা চাই। এই ঠিকানায় পাঠান : ১, ডাঃ কার্তিক বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

যোগাযোগের ঠিকানা (১) c/o ডি. এস. এন্টারপ্রাইজ, ৫২/৯/সি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ (প্রতি সোমবার সন্ধ্যায়)
(২) ১, ডাঃ কার্তিক বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ (প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়)

গ্রাহক চাঁদা (সডাক) বার্ষিক তিন টাকা।
প্রাতিষ্ঠানিক : বার্ষিক পাঁচ টাকা।
স্টলের কমিশন (১০ কপি বা ততোধিক) : ২৫%

খবরের কাগজের খবর

আধুনিকীকরণের নামে অটোমেশন চালু করার অপকৌশল চলছে বিভিন্ন শিল্পে কলে কারখানায় বিভিন্ন উপায়ে। খবরের কাগজ শিল্পও এর প্রভাবমুক্ত নয়। কলকাতার বিখ্যাত এক ইংরেজী দৈনিক **'স্টেটসম্যান'** পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তেমনই এক পদক্ষেপ নিতে চলেছেন দেখে সেখানকার কর্মচারী সংস্থা বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। চলতি ও প্রস্তাবিত এই দুই ব্যবস্থার প্রযুক্তি ও কারিগরী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে তারা তাদের সমস্ত সহকর্মীদের কাছে যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে প্রস্তাবিত ফটোকম্পোজিং ব্যবস্থায় কি বিরাট এক অংশ কর্মী আগামী দিনে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবেন। সংখ্যার হিসেবে বিভিন্ন কারিগরী বিভাগে যেখানে ৭০৬ জন কর্মী প্রয়োজন ছিল ব্যবহার প্রস্তাবিত সেইকাজ সম্পন্ন করতে লাগবে মাত্র ১৯২ জন। এ হল প্রাথমিক পদক্ষেপের ফলশ্রুতি।

যে দেশে কাজ নয়, কাজের লোকের বাড়বাড়ন্ত সেখানে এ ধরনের প্রযুক্তি যে অবান্তর সে বিষয়ে বোধহয় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আলোচনাচক্র

ডি. ডি. কোশাম্বী : বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক

পঃ বঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স'য়েন্স ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৮শে নভেম্বর শনিবার বেলা একটায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইকেট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের সেমিনার কক্ষে "কোশাম্বী : বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক" এই বিষয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে।

সম্পাদকীয়

প্রতি বছরের মত এবারও কেটে গেল পূজোর মরসুম। দুর্গাপূজো আর কালীপূজোকে কেন্দ্র করে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মাতামাতি আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল জনজীবন থেকে আমরা বিজ্ঞানকর্মীরা কতটা বিচ্ছিন্ন। সাধারণ মানুষের জীবনে আনন্দ উৎসব অবশ্যই কাম্য। কিন্তু পূজো-আচ্চা-কুসংস্কারের উপর উপর যদি তা দাঁড়িয়ে থাকে তবে সেখানে অনেক কিছু করণীয় আছে। করণীয় আছে সামাজিক আর রাজনৈতিক কর্মীদের। করণীয় আছে বিজ্ঞানকর্মীদের। পূজোর কদিন বাড়ীতে বসে থেকে বা অন্য কোনভাবে সময় কাটিয়ে হয় এ আত্ম-প্রসাদটুকু লাভ করা যায় যে পূজোর মাতামাতিতে আমরা যোগ দিলাম না, কিন্তু তাতে কাজ হয় না তিলমাত্র। কতখানি মূল্য আদায় করে নিচ্ছে এ মাতামাতি সে সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করার দিকেও এগিয়ে নেওয়া যায় না আশেপাশের মানুষকে। তাও ত দুর্গাপূজো আর কালী-পূজো বছরে একবার হয়। জাঁকজমকটা বেশী বলে আমাদের আর অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের নজর কাড়ে এই দুই পূজো। মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করি অনেকেই। বছরের বাহান্নটা শনিবার রাস্তার মোড়ে মোড়ে শনি-পূজো তাই বড় একটা চোখে পড়ে না। চারদিন কি ছদিনের জায়গায় বাহান্ন দিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে চায় আর কজন? তা ছাড়া, সোজা রাস্তা ত খোলা আছেই। বেশী মানসিক অস্বস্তি হলে 'এ সবের জন্যই সমাজ ব্যবস্থা দায়ী', এই আপ্তবাক্যে নিজেকে ও অপরকে সান্ত্বনা দেওয়া। বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে সংগঠিত ভাবে ধর্মান্ধতা-কুসংস্কার-অপ-বিজ্ঞানের বিপরীতে বিজ্ঞানকে তুলে ধরা তার চাইতে অনেক কঠিন। অবশ্য যদি কাজটা হয় শুধু জ্ঞান দেওয়া, সাধারণ মানুষকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বিজ্ঞানের আলোয় আনার জন্য আধ্যাপকসুলভ উপদেশ দেওয়া, তবে খুব একটা অসুবিধা নেই। কিন্তু মুসকিল হ'ল, এই ধরনের অধ্যাপনায় সাধারণ মানুষ আজ আর বড় একটা উৎসাহ বোধ করে না। যা দরকার তা হল সংবেদনশীলভাবে, সৃষ্টিশীলভাবে ধর্মান্ধতা-কুসংস্কার-অপবিজ্ঞান গোঁড়ামীর মূল উন্মোচন। উপর থেকে নয়, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে, তাঁদেরই চিন্তার মালমসলা ব্যবহার করে। এর জন্য দরকার ধৈর্য, উৎসাহ, সংগঠন, পরিশ্রম। আর সবচাইতে বেশী দরকার বিজ্ঞান সম্পর্কে বই-পড়া তথ্য ও বিমূর্ত চিন্তাকে সাধারণ মানুষের বিচিত্র সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারের সঙ্গে মেলানোর ক্ষমতা অর্জন। স্বীকার করা ভাল, এ ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু এটি অর্জন না করলে, আর এ ক্ষমতার বাস্তব প্রয়োগ না করলে বছরের পর বছর কেবলই ঘুরে ঘুরে আসবে ব্যক্তিগত অস্বস্তি আর ক্ষোভ। আর বিজ্ঞানকর্মীদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বাড়তে থাকবে শনি-দুর্গা-কালী পূজোর মাতামাতি।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮১ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার কার্যনির্বাহক সমিতি ২৯।৯।৮১ তারিখে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকায় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র [নিউট্রন বোমা : বোতলের দৈত্য ফুঁসছে] কিছু অংশ যেমন "রুশ আগ্রাসী সামরিকীকরণের অবিশ্বাস্য মাত্রা কারুর অজানা নয়" সম্পর্কে কিছু বিরূপ অভিমত আমাদের দপ্তরে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার কার্যনির্বাহক সমিতি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, যেহেতু বিষয়টি বিতর্কমূলক এবং এমনকি সংস্থার সভ্যদের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে, সেই কারণে এই ধরনের বিতর্কিত বিষয় নিয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে এই ধরনের বক্তব্য সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে আমরা সচেষ্ট থাকব।

সম্পাদকমণ্ডলী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী।

পত্রিকা সম্পর্কে পাঠক

স্বপন সেন
(পদার্থ বিদ্যাবিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন)

সমস্ত সামাজিক এবং পার্থিব দায়িত্ব ও অধিকার বিস্মরণই যে বিজ্ঞানী হওয়ার একটা বিশেষ লক্ষণ এবং সাফল্য এমত ধারণা অনেকেই পোষণ করেন, এই ধারণার হাওয়া অনেক বিজ্ঞানকর্মীর গায়েও লাগে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, পত্রিকাটি অন্তত সেই হাওয়া থেকে বিজ্ঞানকর্মীদের বাঁচাতে প্রয়াসী হয়েছে এবং আংশিক সফল হয়েছে এ কথা আমি স্বীকার করি। বিজ্ঞানীদের সমাজসচেতন করার এটা নিশ্চয়ই একটা বড় পদক্ষেপ।

যেহেতু পত্রিকাটি যাঁরা বিজ্ঞানের সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত তাঁদের দ্বারা চালিত, প্রতিটি প্রবন্ধ অনেক সুচিন্তিত, তথ্যনির্ভর এবং সর্বোপরি বিশ্লেষণধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়। জুলাই-আগষ্ট সংখ্যার একটি প্রবন্ধে কেমন যেন একগুঁয়েমীর গন্ধ পেলাম। পত্রিকাটি জনপ্রিয় করতে কি কার্টুন দিতেই হবে? কার্টুনের মান বজায় রাখা যাবে তো? SINP, IACS, এবং PRL-এর ওপর আলোকপাত প্রশংসনীয়।

মাইকেল ফ্যারাডে : জীবন ও সময়

[তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ আবিষ্কারের দেড়শত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে 1981 সালটি পালিত হ'চ্ছে পৃথিবী জুড়ে। সেই সূত্রেই আলোচিত হ'ল আবিষ্কর্তা মাইকেল ফ্যারাডের জীবন ইতিহাস।]

বিজ্ঞানের ইতিহাসে মাইকেল ফ্যারাডে একটি অবিস্মরণীয় নাম। বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন ও আধুনিক শিল্পে তার ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হওয়ার মূলে আছে তাঁর নানা আবিষ্ক্রিয়া। বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেককটি ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অসামান্য। অন্তত আধ ডজন এমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তিনি সূত্রপাত করেন যার যে কোন একটি যে কোন বিজ্ঞানীকে ইতিহাসে স্থায়ী আসন দিতে পারতো (জীবনপঞ্জী দ্রষ্টব্য)।

শুধু বিরাট এক বিজ্ঞানী বলেই নয়, দেড়শো বছরের বেশী সময় ধরে তাঁর অম্লান খ্যাতির পিছনে বেশ কিছুটা অবদান আছে তাঁর অসাধারণ, প্রায় অবিশ্বাস্য উত্থানের কাহিনীর। এক সামান্য দরিদ্র কামারের ঘরে জন্মে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় কোনরকম লেখা-পড়ার সুযোগ না পেয়েও কিভাবে তিনি এই অসামান্যতায় পৌঁছেছিলেন তা গভীর গবেষণার বিষয়। সাধারণভাবে তাই তাঁকে ঘিরে কৌতূহল ও বিস্ময়ের শেষ নেই। আজও তিনি কিংবদন্তীর গল্পের নায়ক—তৎকালীন ইংলণ্ডের বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েল ইনস্টিটিউশনের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রে ডেভি মাইকেল ফ্যারাডেকে বই-বাঁধাই-এর কাজ থেকে ডেকে নেন—নিয়োগ করেন সহকারী হিসেবে ; ঈশ্বরদত্ত অসাধারণ প্রতিভাবলে তারপর একের পর এক আবিষ্কারে মেতে ওঠেন ফ্যারাডে—এই হ'ল গল্পের ধুয়ো। প্রবাদের মত মুখে মুখে ফেরে—ডেভির মহত্তম আবিষ্কার ম্যাইকেল ফ্যারাডে। আর ডেভি নিজেও তাঁর জীবনের শেষদিকে গর্বভরে একথাই বলতেন।

অতিসরলীকৃত এই গল্প বা প্রবাদে অনেকটাই অতিশয়োক্তি নিহিত আছে ঠিকই (যা আমরা পরে আলোচনা করব), কিন্তু বাউণ্ডুলে থেকে বিরাট বিজ্ঞানীতে ফ্যারাডের উত্তরণ কিছুটা চমকপ্রদ বৈকি। তবুও, কেমন করে এই 'অসম্ভব' সম্ভব হ'ল, কি ছিল সেই যুগে, তৎকালীন ইংলণ্ডে ও রয়েল ইনস্টিটিউশনে, ডেভিই বা তাঁর স্ফুরণে কতটা সহায়ক হয়েছিলেন, আর কী-ই বা ছিল তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বে—এসব প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তর অবশ্যই পাওয়া যায় তাঁর জীবন ও সময়কে পর্যালোচনা করলে। সেই প্রয়াসই এ প্রবন্ধের অন্তর্বস্তু।

সেই দেশ, সেই কাল :

ফ্যারাডের প্রসঙ্গ আনার আগে সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করা যাক তাঁর কার্যকালের সময়টাকে। মোটামুটি ভাবে ধরতে গেলে 1820 থেকে 1860 যে চল্লিশ বছর বিজ্ঞানী ফ্যারাডে সক্রিয় ছিলেন—বিজ্ঞানের ইতিহাসে সে সময়টা শিল্পবিপ্লবের পূর্ণতার সময় হিসেবে চিহ্নিত। তার ঠিক আগে প্রায় অর্ধশতাব্দীরও কিছু বেশী সময় ধরে শিল্পবিপ্লব একটা সুসংহত রূপ পেয়েছে। আর তারও আগে সতেরো শতকের শেষ দশক থেকে প্রায় আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়টুকু চিহ্নিত হয়ে থাকে শিল্পবিপ্লবের গোড়াপত্তনের কাল হিসেবে। ফ্যারাডের অব্যবহিত পরেই শুরু হয় বিজ্ঞান-ইতিহাসের আর এক নবপর্যায়। উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ জুড়ে স্পষ্ট হতে থাকে বিজ্ঞানের এক নতুনতর প্রেক্ষাপট—প্রস্তুতি চলতে থাকে বিশশতকী বিজ্ঞানের মঞ্চের। মোটের উপর, 1690 থেকে 1870 দেড়শো বছরের কিছু বেশী সময়কাল ধরে শিল্পবিপ্লব প্রথমে ঢিমেতালে চলতে শুরু ক'রে ক্রমে ক্রমে সংহত হয়েছে ও শেষে পরিণতি ও পূর্ণতা লাভ করেছে। ভৌগোলিকভাবে, ইংলণ্ড ছিল তার বিকাশের মূল ক্ষেত্র, ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ইউরোপে ও আমেরিকায়। শিল্পবিপ্লব শিল্পকে প্রধানত শ্রমনির্ভর থেকে প্রধানত যন্ত্রনির্ভর করে তোলে। গড়ে ওঠে বৃহদাকার ফ্যাক্টরী, বহুগুণ বেড়ে যায় উৎপাদন। স্বদেশের বাজারের চাহিদা মিটিয়েও অনেক পণ্য হয় উদ্বৃত্ত। পূর্ববর্তী সমুদ্রযাত্রার কল্যাণে আবিষ্কৃত ও অধিকৃত উপনিবেশ-গুলি হয়ে পড়ে উদ্বৃত্ত শিল্পপণ্যের বাজার। এইসব উপনিবেশ লুঠ করে আসতে থাকে শিল্পপুঁজির কিছু অংশ ; আর আসে শ্রমিক—খনিতে খামারে তারা জোগায় শ্রম। বাণিজ্য ও খনি-খামারের উদ্বৃত্ত আরও সৃষ্টি করে কিছু শিল্প-পুঁজি। ক্রমশঃ চাষবাসেও শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়া লাগে—ব্যবহৃত হতে থাকে যন্ত্র। কৃষিশ্রমিক ও কারুবর্গের (craftsmen) একটা বিরাট অংশ বৃত্তিচ্যুত হয়ে পরিণত হয় কারখানা শ্রমিকে বা গ্রহণ করে নতুন কোন শহুরে কাজ। শিল্পবিপ্লবের পথ বেয়ে শহুরে বুর্জোয়া চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করে, ধনতন্ত্র কায়েম হয়। বৈদেশিক বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় একদিকে যেমন ইউরোপীয় দেশগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হতে থাকে অন্যদিকে তেমনি বিশ্বজুড়ে বাজারের পরিধিও বাড়তে থাকে।

শিল্পবিপ্লবের শুরুতে বিজ্ঞানের সরাসরি ভূমিকা ছিল নগন্য। বৈজ্ঞানিক নিয়মনীতির সচেতন ব্যবহার প্রায় সীমিত ছিল স্টিম ইঞ্জিন

তৈরীর মধ্যে। তাও সে একেবারে শুরুর পর্যায়ে। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে স্টীম-ইঞ্জিন নব নব রূপ পেয়েছে। মূলত হাতে-কলমে গড়ে ওঠা ইঞ্জিনীয়ার (**Practical engineers**)-দের হাতে। নিউকামেন বা ম্যাথুবুল্টন জেমস ওয়াট বা জর্জ স্টিফেনসন এঁদের কারুরই প্রথাগত বিজ্ঞানশিক্ষা ছিল না। বস্তুত, শিল্পবিপ্লব ছিল মূলত প্রযুক্তিগত। নতুন নতুন যন্ত্র তৈরী হয়েছে এবং মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম এত ব্যাপকভাবে সেগুলি ব্যবহৃত হয়েছে ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের জন্য। পূর্ববর্তী সতেরো শতকের সুসংবদ্ধ প্রকৃতিবিজ্ঞান—নিউটন যার পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরেন—সেই বিজ্ঞান-বিপ্লব থেকে শিল্পবিপ্লবের চেহারা আলাদা। বিজ্ঞান-বিপ্লব মূলত প্রকৃতিকে বোঝার মধ্যে নিহিত ছিল—তার উপকরণ ছিল টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার ইত্যাদি। কিন্তু শিল্পবিপ্লব আনল বাষ্পশক্তি, তৈরী করল ষ্টীম-ইঞ্জিন, শুরু করল কয়লার ব্যবহার, তৈরী করে ফেলল শিল্পযুগের একান্ত উপযোগী ইস্পাত, এবং আরও পরে টার্বাইন, ডায়নামো, মোটর ইত্যাদি। শিল্পবিপ্লব বিজ্ঞানকে ততটুকুই ব্যবহার করল—যতটুকু হ'লে তার শিল্পোৎপাদন ও মুনাফার ধারা থাকে অব্যাহত। উদ্ভাবনী শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেল নানা অর্থকরী যন্ত্র ও কৃৎকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে। এবং তা হল অক্সফোর্ড 'কেম্ব্রিজ' লণ্ডন ইত্যাদি সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়কে পাশ কাটিয়ে। এ যুগের উপযোগী উদ্ভাবন আসতে লাগল বার্মিংহাম, গ্লাসগো, ম্যানচেস্টার, এডিনবরা ইত্যাদি শিল্পশহর থেকে।...কিন্তু ক্রমশ বিজ্ঞানের উপর চাপ আসতে লাগল। যেমন, বয়নশিল্পের উন্নতির জন্য, কয়লার সদ্ব্যবহারের জন্য, খনির বিস্ফোরক গ্যাস থেকে নিরাপত্তার জন্য। ইস্পাতের কাঠিন্য বাড়াবার বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ক্রমশ বেশী করে প্রয়োজন পড়ল রাসায়নিক গবেষণার। নতুন শক্তির সন্ধানে এবং শক্তিগুলিকে (যেমন, তাপীয়, যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক,) একটি থেকে আর একটিতে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন হ'ল নতুন গবেষণার এবং তাই সূত্রপাত ঘটাল তাপগতিবিদ্যার (**Thermodynamics**) এবং তড়িৎ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের।...অর্থাৎ, এক কথায়, বিজ্ঞান কিন্তু শিল্প বিপ্লব থেকে আহরণ করল অনেক কিছু। উনিশ শতকের শেষে এসে দেখা যায় রসায়ণ শক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেয়েছে; শক্তির রূপান্তর ও অবিনাশীতা সাধারন সূত্রে বিন্যস্ত হয়েছে, ধাতু ও যন্ত্রবিদ্যা বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে বিশেষ মনোযোগ দাবী করছে; ভূপ্রকৃতি ও প্রাণীজগৎ সম্পর্কেও গড়ে উঠেছে এক সংহত জ্ঞান।...কারা এসব সম্ভব করলেন? না, তাঁদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা-আঁটা বিজ্ঞানী নন। অন্তত আঠার শতক জুড়ে তাঁরা ছিলেন পাদপ্রদীপের আড়ালে—। এ সময়কার বিজ্ঞানীদের অনেকেই গড়ে উঠেছেন শখের বিজ্ঞান চর্চার বা শিক্ষানবীশীর মাধ্যমে। গোটা আঠার শতক জুড়ে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে, এঁরাই ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। উনিশ শতকে ছবিটা পাল্টাতে থাকে, মঞ্চে আবির্ভাব ঘটতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—বিজ্ঞানীদের। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যুগ-প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত হতে থাকে দীর্ঘদিনের বিরোধিতার ভূমিকা বর্জন করে। শিল্পশহরগুলিতে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তিবিদ্যা-কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। স্থাপিত হয় শিল্পমুখী নতুন গবেষণা কেন্দ্র ও বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পেশা ভিত্তিক নানা সোসাইটি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে লণ্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউশন এরকমই একটি নতুন প্রতিষ্ঠান (1799)। ফ্রান্সে ও জার্মানীতে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত বিজ্ঞানীরা কিছুটা আগে—আঠার শতকের শেষার্ধ—থেকেই প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করেন। তবে উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে পৌঁছে গোটা ইউরোপেই অবস্থাটা পুরোপুরি উল্টে যায়—বিজ্ঞানী বলতে তখন প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-গবেষক, বা ডিগ্রীধারী গবেষক-দেরই বোঝা যেতে থাকে।

সুতরাং একথা নিশ্চয় বলা যায় যে শিল্পবিপ্লবের শুরুতে বিজ্ঞানের ভূমিকা কিছুটা নিষ্প্রভ ও নিষ্ক্রিয় হ'লেও ক্রমে তা সক্রিয় ভূমিকা নিতে থাকে—প্রথমতঃ শিল্পের চলার পথের সমস্যাগুলি সমাধানের প্রয়োজনে, পরে শিল্পকে নতুন, বড়, আরও কার্যকরী যন্ত্র ও কৃৎকৌশল সরবরাহ করে তাদের উৎপাদন ও মুনাফা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে। স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞানীরা তখন সমাজে বেশ সম্মানিত ব্যক্তি। আঠার-উনিশ শতক জুড়ে তাই এমন অনেক বিজ্ঞানীর সন্ধান পাওয়া যায়—যাঁরা প্রথাগত শিক্ষা পেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের কেউবা হতে গিয়েছিলেন ধর্মযাজক (প্রিস্টলে, মেণ্ডেল), কেউ বা আইনজ্ঞ (অ্যাভোগাড্রো) কেউ বা ডাক্তার [ওহ্‌লার, ডারউইন], কেউ বা সমাজসেবী (বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন, টমসন) কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরা পরিণত হন বিজ্ঞানীতে।

এবং ফ্যারাডে

পূর্বাপর মাথায় রেখে উনিশ শতকের এই সাধারণ পটভূমিতে ফেলে যদি আমরা ফ্যারাডেকে ও তাঁর কাজকে পর্যালোচনা করি তা'হলে কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর অনেকটা কেটে যায়। শিল্পবিপ্লবের সেই পর্যায়ে যখন শত শত কৃষিশ্রমিক ও কারিগর বৃত্তিচ্যুত হয়ে ভাগ্যান্বেষণে শহরের দিকে ধাওয়া করছে তখন কামারের সন্তান ফ্যারাডেও স্বাভাবিকভাবেই বই ব্যবসায়ী জর্জ রিবোর দোকানে ফাই-ফরমাশ খাটার কাজে নিযুক্ত হন। অল্প বয়সেই জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত তাঁর বুদ্ধিকে করে তুলেছিল পরিণত। সেখানে ম্যাসকারিয়ে নামক এক ফরাসী ভদ্রলোকের সংস্পর্শে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার হয়; প্রায় সমবয়সী বন্ধু অ্যাবো'র

(Abbot) সঙ্গে গড়ে ওঠে এক পারস্পরিক শিক্ষার চক্র। জর্জ রিবোর ভাণ্ডার ছিল তাঁদের লাইব্রেরী। দুই বন্ধু, 'সহপাঠী', বই পড়ে, আলোচনা করে, আবার 'বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলো পরিস্কার' করে নেওয়ার জন্য সামান্য সঞ্চয়ও খরচ করে ফেলে টুকিটাকি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। সুতরাং রিবোর দোকান ফ্যারাডের জীবনে হয়ে উঠেছিল এক সার্থক স্কুল। নিয়োগকর্তা ফ্যারাডের উপর খুশী ছিলেন, তাঁর সম্মতিক্রমেই ফ্যারাডে শিখতে লাগলেন বই-বাঁধাই-এর কাজ। আর মাঝে মধ্যেই সুযোগমত হাজির হ'তে লাগলেন স্থানীয় বিজ্ঞানসভায় শ্রোতা হিসেবে। এমনি এক সুযোগেই তিনি শুনলেন জনৈক মিঃ টাটুমের এক ডজন প্রকৃতিদর্শন বিষয়ক বক্তৃতা। তারপর সেগুলির নোট তৈরী করে চারখণ্ডে বাঁধিয়ে রিবোকে উপহার দিয়ে বসলেন। সেই নোট দেখে দোকানের এক পৃষ্ঠপোষক দাঁস (Dance) ফ্যারাডেকে উপহার দিলেন রয়েল ইনস্টিটিউশনের চারটি সান্ধ্য বিজ্ঞান-বক্তৃতার প্রবেশপত্র। পর পর চারটি শুক্রবার স্যার হামফ্রে ডেভির রসায়ন বিষয়ক বক্তৃতাগুলি শুনতে শুনতে বিজ্ঞানের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করার বাসনা দানা বাঁধল ফ্যারাডের মনে। ইতিমধ্যে শিক্ষানবিশী শেষ করে তিনি জ লা রোশ নামক আর এক ভদ্রলোকের দোকানে বই-বাঁধানোর কাজে ঢুকেছেন। উদ্দীপিত ফ্যারাডে রয়েল ইনস্টিটিউশনের সভাপতিকে একটা চিঠি লিখে বসলেন যে কোন একটা কাজের আবেদন জানিয়ে। কিন্তু না, কোন সাড়া মিলল না। এবার ফ্যারাডে সরাসরি ডেভিকেই চিঠি দিলেন—তাঁর ইচ্ছার কথা জানিয়ে। আর সঙ্গে পাঠালেন ডেভি-প্রদত্ত বক্তৃতার বাঁধানো নোট। ডেভি তাঁকে উপেক্ষা করতে পারেন নি. কিন্তু ল্যাবরেটারীর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পদে নেবার আগে বার বার তিনি ফ্যারাডেকে নিরস্ত করতে চাইলেন—ঝোঁকের মাথায় ফ্যারাডে যেন পুরনো কাজের সম্ভাবনা উপেক্ষা না করে। আশ্বাস দিলেন যে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা ফ্যারাডেকে দিয়েই বই বাঁধাবেন। আরও জানালেন যে বিজ্ঞান এক 'নির্দয় প্রেয়সী' (hard mistress), 'সেবকদের পুরস্কারে অত্যন্ত কৃপণ'। অবিচল ফ্যারাডে বিজ্ঞানসেবীদের উচ্চ নীতিবোধের কথা বলায় ডেভি মৃদু হেসে বললেন কয়েকবছরের অভিজ্ঞতায় মাইকেল নিজেই তার ভুল শুধরে নিতে পারবে।...

সত্যিই ডেভির কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন ফ্যারাডে যখন ডেভি নিজেই ইউরোপ ভ্রমনের সময় ফ্যারাডের সাথে একসঙ্গে বসে ডিনার খেতে আপত্তি করেছিলেন, যখন ডেভি রয়েল সোসাইটির সভ্য হিসেবে ফ্যারাডের নাম প্রস্তাবে বিরোধিতা করলেন বা যখন তিনি ফ্যারাডেকে অভিযুক্ত করলেন বিনা অনুমতিতে তাঁদের (তাঁর ও উলাস্টনের) বৈদ্যুতিক মোটরের মূলনীতির পরীক্ষাবিষয়ক আইডিয়া চুরি করার দায়ে। অবশ্য ফ্যারাডের কাছে ডেভি ছিলেন অনুপ্রেরণার এক জীবন্ত উৎস এবং শেষ দিকে ডেভিও সম্ভবত নিজের ভুল বুঝতে পেরে-ছিলেন। ল্যাবরেটারীর ডিরেক্টর পদের জন্য ফ্যারাডের নাম ডেভি নিজেই সুপারিশ করেছিলেন (1825)।

সে যাহোক, অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু ফ্যারাডে ডেভির কাছে অপরি-হার্য সহকারী হয়ে উঠলেন। ইউরোপ থেকে ফেরার পরে পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশের আগে পরীক্ষাগারের নিভৃতে ডেভির সান্নিধ্যে, সাহচর্যে ও নির্দেশে নীরব সাধনায় আরও পাঁচটি বছর অতিবাহিত হয় ফ্যারাডের। ...একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় ফ্যারাডের মত সুদীর্ঘ [1813-20] ও সুসম শিক্ষা যে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দুর্লভ হতো। "তাঁর বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল ইউরোপ, যে সব প্রভুদের তিনি সেবা করেছেন, ডেভির খ্যাতি যাঁদের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করেছিল, তাঁরা ছিলেন তাঁর শিক্ষক" —লিখেছেন গ্লাডস্টোন। আর সত্যি, একের পর এক অ্যাম্পিয়ার, গে-লুসাক, ভোল্টা, কাউন্ট রুমফোর্ড প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের সান্নিধ্যে আসা যে কোন শিক্ষার্থীর পক্ষেই এক বিরল সৌভাগ্য। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ফ্যারাডের অশিক্ষিত পটুত্বের গল্প নিছকই গল্প। শিক্ষায় তাঁর ঘাটতি ছিল না। হয়তো সে শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রাজপথ বেয়ে এগোয় নি, আর তাঁর ক্ষেত্রেই যে শুধু এমন ব্যতিক্রম ঘটেছিল তাও নয়। তাঁরই মত আঁকাবাঁকা পথে হাতেকলমে পরীক্ষানিরীক্ষা অথবা শিক্ষানবিশীর পথ বেয়ে তাঁর পূর্বসূরী বিজ্ঞানী-দেরও অনেকেই শিক্ষিত হয়েছেন, স্বয়ং ডেভিও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। এই পথই শিল্পবিপ্লবের সময়কার বিজ্ঞানীদের পুরনো পথ। আঠারো শতকে এ পথ যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল—উনিশ শতকে ধীরে ধীরে ক্ষীন হয়ে মিলিয়ে গেছে। মাইকেল ফ্যারাডে, তাই, ইংলণ্ড তথা ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের কালে পুরনো ধারার বিজ্ঞানীদের শেষ দিকের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি।...

রয়েল ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল শিল্পবিপ্লবের বিশেষ চাহিদা মেটানোর অন্যতম উদ্দেশ্য নিয়ে। স্বভাবতই ডেভি-ফ্যারাডেরা এমন সব বিষয় নিয়ে সেখানে গবেষণা করেছেন যা মূলতঃ তখনকার প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে খনি-মালিক-দের অনুরোধে ডেভির খনি নিরাপত্তা বাতি আবিষ্কারের কথা। ডেভি প্রদর্শিত পথেই ফ্যারাডে প্রথমে রাসায়নিক গবেষণায় মন দেন। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে তিনি বেশ কিছু রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কার করেছেন, উদ্ভাবন করেছেন ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদিকে স্বীয় চাপে তরলীকরণের পদ্ধতি। ইস্পাত নিয়ে গবেষণাও ছিল যুগেরই প্রয়োজনে। বিদ্যুৎ ও চুম্বক সংক্রান্ত কতকগুলি আবিষ্ক্রিয়া শিল্পে তাদের ব্যবহারের যে সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছিল তাকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ফ্যারাডে না হয় অন্য

যে কোন বিজ্ঞানীকে সে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতেই হতো। তার ক্ষেত্র ছিল প্রস্তুত। সর্বোপরি শিল্পবিপ্লব সম্ভব করে তুলেছিল সুসংহত গবেষণা, যোগান দিতে পেরেছিল প্রয়োজনীয় অর্থ ও সংগঠন।

আগেই আলোচনা করেছি যে শিল্পবিপ্লবের যুগটা ছিল মূলত প্রয়োগ ও প্রযুক্তি কেন্দ্রিক। যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাই সেখানে মূল কথা। তত্ত্ব সেখানে, কাজে না লাগলে, অবান্তর। আর এ যুগের প্রায়োগিক সাফল্যই খুলে দিয়েছিল তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র; উনিশ শতকের শেষার্ধে এসে যেগুলি স্পষ্ট হতে থাকে। এমনি একটি ক্ষেত্র হল তড়িৎ ও চৌম্বকত্ব। এক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ও প্রয়োগিক সাফল্য না হলে তত্ত্বগত সাফল্য আসা অসম্ভব ছিল, সেটুকু সমাধা করলেন ফ্যারাডে। শুধুমাত্র বিজ্ঞানের অবস্থার বিচারে বলা যায় ভোল্টা, অ্যাম্পিয়ার–ওয়ারস্টেড—ডেভিরা যেমন তাঁদের পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা সম্ভব করে তুলেছিলেন ফ্যারাডের কাজের সাফল্য তেমনি ফ্যারাডের কাজ সম্ভব না হলে, অসম্ভব হতো ম্যাক্সওয়েল–আইনস্টাইনদের সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হওয়া। বিশশতকী বিজ্ঞানের নবতর সাফল্য ও জয়যাত্রার সুসংহত পটভূমির রূপরেখা তৈরী হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে। ফ্যারাডে শিল্পবিপ্লবের যুগকে তার দরজায় পৌঁছে দেন—চৌম্বক ক্ষেত্রে ও বলরেখার তত্ত্বের মাধ্যমে। সতেরো শতকের শেষে যেমন নিউটন বিজ্ঞান-বিপ্লব ও শিল্পবিপ্লবের সেতুর ভূমিকা পালন করেছিলেন উনিশ শতকে ফ্যারাডে তেমনি শিল্প বিপ্লব ও আর এক উন্নততর বিজ্ঞান-বিপ্লবের যুগের মধ্যে সংযোজকের ভূমিকা পালন করলেন।

তবে কি ফ্যারাডের নিজস্ব প্রতিভা, অসাধারণ উদ্ভাবনীক্ষমতা বলে কিছুই ছিল না? দেশকালের প্রয়োজনই যদি ফ্যারাডের কাজের মূল নির্ধারক হয়, তবে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কোথায়? বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। দেশ কালের পরিমণ্ডলে বৈজ্ঞানিক সাফল্যের সম্ভাবতা নিহিত থাকে ঠিকই, তবে একজন বিশেষ ব্যক্তি বিজ্ঞানী –অন্য সকলকে ছাপিয়ে সফল হন, সেটা তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বে ও কৃতিত্বে—একথা অস্বীকার করা যায় না। বার্নালের কথায় বলতে গেলে—"বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায় কোন আবিক্রিয়া কিভাবে হবে সেটা জানায় অসুবিধা ততটা নয়, যতটা আবিক্রিয়ার ঘটনাকে বুঝতে পারায়।…কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যদি বহু লোক একসঙ্গে প্রয়াস চালান, তবে কিছুটা আগে বা পরে, এমন কাউকে না কাউকে দেখা যায়ই যিনি সতর্ক পর্যবেক্ষক, যথেষ্ট খোলা মন সম্পন্ন এবং প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব সম্পর্কে হয় অনবহিত নাহয় তার ভুলত্রুটি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তিনিই ধরতে পারেন আবিক্রিয়াটিকে।"

কষ্টসাধ্য অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবলে ফ্যারাডে হয়ে উঠেছিলেন এক নিপুণ পর্যবেক্ষক। তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় অল্পবয়সেই বিজ্ঞানকে কর্ম-ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেবার মধ্যে। ডেভি এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের পন্থা-পদ্ধতি তিনি যে কত খুঁটিয়ে নজর করতেন তা বোঝা যায় যখন দেখি যে রয়েল ইনস্টীটিউশনে যোগ দেবার অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বক্তৃতার কায়দা বিষয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখছেন বন্ধু অ্যাবোকে। নানাবিধ পরীক্ষা সহযোগে বিজ্ঞান বক্তৃতায় ফ্যারাডে যে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তা অকারণে নয়। তাঁর প্রতিটি সফল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পিছনেও ছিল দীর্ঘ অধ্যবসায়ী প্রয়াস। 1831-এ তড়িচ্চুম্বকীয় আবেশ সম্পর্কিত সফল পরীক্ষার আগে অন্তত চারবার তিনি বিফল হন। পূর্বসূরীদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিজে হাতে সম্পাদন করেন, সেগুলিকে নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, 1820 থেকেই সমস্যাটি নিয়ে তিনি ভাবছিলেন ও পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের অন্তত একজন (অ্যারাগো) সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও আবিক্রিয়াটি অল্পের জন্য ধরতে পারেননি।

ফ্যারাডে একজন সত্যিকারের খোলা মনের মানুষ ছিলেন। প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব যে সম্ভাবনাকে গোড়াতেই উড়িয়ে দেয়, সেটিকেও ফ্যারাডে যাচাই না করে বাতিল করতে চান না। অনেকে মনে করেন সুসমঞ্জস প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকায় ফ্যারাডে প্রচলিত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন না বলেই অনেক আপাত অসম্ভব 'সম্ভাবনা' তাঁর মনে ঠাঁই পেত। এ কথার মধ্যে কতটা সত্যতা আছে বলা মুস্কিল কেননা তাঁর পূর্বসূরী ও সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কাজের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সমস্ত রকম লোভ ও আসক্তির উর্দ্ধে ফ্যারাডে নিজেকে তুলতে পেরেছিলেন। জীবনে বহুবার তিনি বড় পদের হাতছানি (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদ, রয়েল সোসাইটির সভাপতি পদ, নাইট উপাধি) অনায়াসে উপেক্ষা করেছেন। তাঁর কাজের বিপুল অর্থকরী সাফল্যও তাঁকে উদ্ভাবনসমূহের পেটেন্ট নিতে বা ব্যবসায়ে নামতে প্রলুব্ধ করেনি; অতি সহজেই তিনি গবেষণার স্বার্থে বেশ বড়রকম বাড়তি আয়ের পথ ত্যাগ করেছেন। বন্ধু টিণ্ডালকে একসময় তিনি লিখেছিলেন তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিল বিজ্ঞান অথবা সম্পদ কোনটাকে তিনি জীবনের লক্ষ্য করবেন। "জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি থাকব শুধুই মাইকেল ফ্যারাডে"—এই ছিল তাঁর কথা। ডেভির কাছে বারংবার আঘাত ও বিরোধিতা পেয়েও তিনি কোনদিন ডেভির প্রতি এতটুকু অসম্মান দেখাননি—বরং কেউ ডেভি সম্পর্কে কটূক্তি করলে রেগে যেতেন। অথচ 1828 সালে ডেভির মৃত্যুর পরই ফ্যারাডে তাঁর মহত্তম আবিষ্কারগুলি সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। শুধু বিজ্ঞানী নয়, যে কোন বড় মাপের মানুষের মধ্যেই এসব গুণের সমাবেশ ঘটতে হয়, ব্যাক্তিটিকে

বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করতে। আর এসব গুণাবলী অর্জনের জন্য কঠোর অনুশীলন ও নিয়মানুবর্তিতা অপরিহার্য।

ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে পারিবারিক সূত্র ধরেই ফ্যারাডে ছিলেন সক্রিয় উৎসাহী। তদানীন্তন ইংলণ্ডের নানারকম বিপরীতমুখী দার্শনিক ভাবনা আন্দোলন ও অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির ঘূর্ণাবর্ত প্রগতিশীল বুর্জোয়াশ্রেণী—যে শ্রেণীর কাছাকাছি ছিল ফ্যারাডের অবস্থান—প্রধানত আশ্রয় নিয়েছিল এক নতুন মনগড়া পুনরুজ্জীবিত উদার ধর্মনীতির মধ্যে। ফ্যারাডেও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না, থাকা দুরূহ ছিল। ফ্যারাডে নিজেই তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞানকে আলাদা করে দেখাতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানের সেবার জন্যই, বিজ্ঞান অনুশীলনের মধ্য দিয়েই যে উচ্চনীতিবোধ অর্জিত হয় এ বিশ্বাস তাঁর গোড়া থেকেই ছিল। বিজ্ঞান জগতে প্রবেশের আগেই, ডেভির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের সময়ই তিনি সেকথা উল্লেখ করেছিলেন। তবুও, বহু 'পর্যালোচক' তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী ও তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের মধ্যে ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার ছাপকেই প্রাধান্য দেন, এটা খুবই আশ্চর্যের।

উৎসনির্দেশ :

1. 100 Greet Scientist —J. E. Greene (Ed.) WSP.
2. Encyclop. Britanica, Encyclop. Americana.
3. Contributions of Faraday and Maxwell to Electricity & Magnetism—Tricker
4. The Life and Letters of Farady—Dr. Bence Jones
5. Science in History (Vol. 2, Illustrated Edn) —J. D. Bernal.

—সুধীন মজুমদার

জীবনপঞ্জী—মাইকেল ফ্যারাডে

1791 (22 সেপ্টেঃ)—জন্ম।
1804 পুস্তক ব্যবসায়ী জর্জ রিবোর কাছে কাজে যোগদান।
1810 পিতার মৃত্যু।
1812 দ্য লা রোশের অধীনে বই বাঁধাইকারীর কাজ গ্রহণ।
1813 রয়েল ইনস্টিটিউশনে ল্যাবরেটারীতে অ্যাসিস্টান্ট পদে যোগদান
1813-15 ডেভির সঙ্গে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ ভ্রমণ।
1815 রয়েল ইনস্টিটিউশনে ল্যাবরেটারী ও খনিজ সংগ্রহশালার অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-যন্ত্রপাতির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হিসেবে পুনর্নিয়োগ।
1815-20 কার্বন ও ক্লোরিনের দুটি নতুন যৌগ আবিষ্কার এবং অন্যান্য রাসয়নিক গবেষণা।
1821 চৌম্বক মেরুর ক্ষেত্রে পরিবাহী বৈদ্যুতিক তারকে ঘোরানোর সফলতা, বিবাহ।
1823-24 ক্লোরিন ও অন্যান্য গ্যাসকে তরলীকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন।
1824 রয়েল সোসাইটির সভ্য।
1825 বেনজিন পৃথকীকরণ ; ল্যাবরেটারীর ডিরেক্টর।
1826 প্রথম সালফনিক অ্যাসিড যৌগ-সালফো-ন্যাপথালিক অ্যাসিড প্রস্তুতি।
1831 তড়িচ্চুম্বকীয় আবেশ আবিষ্কার।
1832 তড়িৎ বিশ্লেষণের মূলসূত্র নির্ধারণ।
1833 তড়িতের রাসায়নিক ভিত্তির প্রমাণ।
1834 স্ব-আবেশ প্রদর্শন।
1835 চৌম্বক বলরেখার অস্তিত্ব নির্দেশ ও প্রকৃতি নিরূপণ।
1838 'এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চেস ইন ইলেকট্রিসিটি' শীর্ষক পুস্তক প্রণয়ন।
1840-44 ভগ্নস্বাস্থ্য, কর্মবিরতি।
1845 'ফ্যারাডে এফেক্ট' প্রদর্শন (চৌম্বক ক্ষেত্র ও সমবর্তিত (polarised) আলোর সম্পর্ক বিষয়ক)।
1856 ধাতব কলয়েড প্রস্তুতি (colloidal Gold)।
1953 রাণী ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে বাসস্থান উপহার পাওয়া।
1861-62 চৌম্বক ক্ষেত্রে আলোক প্রতিসরণের অসফল প্রয়াস ; অভিকর্ষ ও তড়িতের সম্পর্ক নির্ধারণের অসফল পরীক্ষা।
1867 মৃত্যু।

মানবদেহে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঃ কিছু প্রাসংগিক আলোচনা

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকাল রিসার্চ (ICMR) ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণার প্রধানতম কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই সংস্থাটি ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণার প্রেরণা, পরামর্শ এবং আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। তাছাড়া, নিজের সরাসরি তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই সংস্থার কতকগুলি স্থায়ী ইনষ্টিটিউট আছে। আয়ুষ্কালের বিবেচনায় সংস্থাটি নিতান্ত অর্বাচীন নয়। জন্ম ১৯৩৮ সালে, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এর নাম ছিল ইণ্ডিয়ন রিসার্চ ফাণ্ড অ্যাসোসিয়েশান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দ্বিজত্বপ্রাপ্তি হয়ে এর নাম হয় ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকাল রিসার্চ, হিন্দী ভাষান্তরে ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদ।

এই দীর্ঘ সময়ে এই গবেষণা সংস্থার অধীনস্থ ইনষ্টিটিউটসমূহে বা এর সাহায্যপুষ্ট হয়ে ভারতের বিভিন্ন হাসপাতাল বা জনপদে অনেক রকমের গবেষণাকর্ম হয়েছে। এসব গবেষণা যেহেতু মূলতঃ চিকিৎসা বা আয়ুর্বিজ্ঞান সংক্রান্ত, এদের মধ্যে অনেক পরীক্ষা মানুষের দেহেও করা হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় বা বিজ্ঞানীমহলের আলোচনায় মাঝে মধ্যে সন্দেহ প্রকাশ হয়েছে যে মানবদেহে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সবগুলিই নির্দোষ ছিল না বা অনেকগুলিরই উদ্দেশ্য আমাদের দেশের কল্যাণে প্রযুক্ত ছিল না। এ পর্যন্ত নির্বিকার ঔদাসীন্যে ICMR এসব বাজে কথায় কর্ণপাতও করে নি। জীবজন্তুর দেহে পরীক্ষা আর মানুষের দেহে পরীক্ষার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অনেক বেশী সতর্কতার প্রয়োজন হয়, অনেক রীতিনীতি বিধিনিষেধের পরোয়া করতে হয়। ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণার পুরোধা এই সংস্থাটি সে সম্পর্কে কিন্তু এ পর্যন্ত কোনই উচ্চবাচ্য করে নি, নিজের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কখনও গবেষকদের জানান প্রয়োজন মনে করে নি যে মানুষের উপর যে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কতকগুলি পূর্বশর্ত আছে, যেগুলি আবশ্যিকভাবে মানতে হয়।

সুখের কথা, দেরীতে হলেও ICMR-র অবশেষে চৈতন্যের উদয় হয়েছে। কিছুকাল আগে নিজের একটি পত্রিকায় এই সংস্থা মানবদেহে পরীক্ষায় পালনীয় রীতি-নীতি সম্পর্কে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। দীর্ঘ তিন মুদ্রিত পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিজ্ঞপ্তিতে অনেক কথা আছে। এসবের মোদ্দা কথা হল, আগে গবেষণাগারে বিস্তৃত পরীক্ষা করে দেখতে হবে পরীক্ষাটি মানুষের দেহে করার যৌক্তিকতা আছে কিনা এবং পরীক্ষাটি কোন পদার্থের হলে পদার্থটি নির্দোষ ও কার্যকরী কিনা। যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বে পরীক্ষা হবে এবং যার দেহে প্রযুক্ত হবে, তাকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে তার সম্মতি (informed consent) পেতে হবে, নাবালকের ক্ষেত্রে এই সম্মতি দেবেন অভিভাবক। মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি বা বন্দীদের উপর কোন পরীক্ষা করা উচিত নয় (ICMR Bulletin, September, p 1-3, 1980)।

রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'। দেরীতে হলেও কোন শিক্ষা বা কোন বিষয়ে সচেতনতা উপেক্ষণীয় নয়। তবে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অস্তিত্বের পর এরূপ বিবৃতি প্রচার, মানুষের নিরাপত্তা সম্পর্কে হঠাৎ-জাগ্রত এই মমত্ববোধ, ICMR-র বরফ-কঠিন জাড্যে কি করে জাগল, কারুর কারুর মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে। এর উত্তর পেতে হলে আমাদের একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে।

১৯৭৪-৭৬ সালে এই কলকাতা শহরের পূর্বাঞ্চল বেলেঘাটা-মাণিকতলার নিম্নবিত্ত এলাকার হাজার হাজার মানুষের উপর দুটি নতুন ওষুধের পরীক্ষা চালান হয়। পরীক্ষাদুটির উদ্যোক্তা ICMR-র কলিকাতাস্থ ইনষ্টিটিউট 'কলেরা রিসার্চ সেন্টার' (বর্তমানে এর নাম ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অফ কলেরা অ্যাণ্ড এণ্টেরিক ডিজিজেজ)। বিদেশী সংস্থার আনুকূল্যে ও তাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই পরীক্ষাদুটিতে ইচ্ছাকৃতভাবে দেশের ভেষজ আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত রীতিনীতিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধের অপলাপ করে সরল অসহায় মানুষকে পরীক্ষার গিনিপিগ করা হয়েছে [Mainstream, May 30, 1981]। এই জন বিরোধী অপ-পরীক্ষার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে এই ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের সংগঠন। ICMR-কর্তৃপক্ষ থেকে সুরু করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে এইসব প্রতিবাদ জানান হয়েছে। অপরাধীদের শাস্তি বিধানের বদলে ICMR কর্তৃপক্ষ দমন-পীড়ন চালিয়েছেন এইসব প্রতিবাদী বিজ্ঞানীদের উপর, পরিশেষে ছয়জন সিনিয়র বিজ্ঞানীকে ইনষ্টিটিউট ছাড়তে বাধ্য করেছেন [পরিবর্তন, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৮১]। স্বশাসিত গবেষণা-প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মীদের কেন্দ্রীয় সংস্থা "জ্যাকারি" [JACARI] পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের ভেষজ নিয়ামক (Drugs Controller) ও পুলিশের কাছে এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানিয়েছে (সত্যযুগ, ১৩ই জুন, ১৯৮১)।

বিজ্ঞানীদের লাঞ্ছনা ছাড়া এইসব প্রতিবাদের কোন দৃশ্যগত ফল হয়

নি বটে, তবে ভরসার কথা ICMR একটা বড় শিক্ষা পেয়েছে এই ঘটনা পরম্পরা থেকে। তা হল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ভাষা পাচ্ছে, ধীরে হলেও লোকের চেতনা বাড়ছে, নির্বিবাদে সন্দেহজনক কিছু করা সম্ভব নয় আর। তাই আমরা দেখতে পাই কলেরা রিসার্চ সেন্টারের ১৯৭৬ সালের উপদেষ্টা কমিটিতে ICMR-র ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ গোপালন বলছেন যে একটা রীতিনির্ধারক কমিটি করে তার মাধ্যমে মানবদেহে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আইনগত, নৈতিক এবং অন্যান্য দিক আগে পরীক্ষা করে দেখা যুক্তিযুক্ত (Proceedings of the Scientific Advisory Committee of Cholera Research Centre, 1976, p. 2)। এই ঘোষণার ঠিক আগেই দুটি পরীক্ষা বিরাটসংখ্যক মানুষের উপর করা হয়েছে এবং এই ব্যক্তিই ডিরেক্টর-জেনারেল হিসেবে সেই অমানবিক ও বে-আইনী কাজের হোতাদের সস্নেহে প্রশ্রয় দিয়েছেন, বিজ্ঞানকে ধর্ষণ করেছেন এবং সচেতন বিজ্ঞানীদের লাঞ্ছিত করেছেন। অবশেষে নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁর চৈতন্যোদয় হয়েছে! যাহোক, সেই প্রস্তাবনার অঙ্কুরই ক্রমে বিস্তৃততর রূপ পেয়ে পেয়ে ১৯৮০ সালে ICMR-র এই বিজ্ঞাপ্তির আকার ধারণ করেছে।

ICMR-র এই বিজ্ঞাপ্ত এই ধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে ভারতে অদ্যাবধি মানুষের দেহে পরীক্ষায় ব্যাপারে কোন রীতিনীতি ছিল না, ছিলনা কোন আইনগত বিধিনিষেধও। সম্ভবতঃ ১৯৭৪-৭৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিজেদের অবৈজ্ঞানিক কাজ ঢাকতেই ICMR-র এই হচতুর প্রয়াস। কারণ রীতিনীতি (ethics) আগে থেকেই ছিল, ছিল আইনগত নিয়ন্ত্রণও।

নাৎসী কন্‌সেন্‌ট্রেশান ক্যাম্পে বন্দীদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিভীষিকাপূর্ণ বিবরণ ন্যুরেমবার্গ আদালতে বেরোতে সুরু করলে স্তম্ভিত বিশ্ববিবেক আবলম্বে কতকগুলি রীতিনীতি প্রণয়ন করে। ন্যুরেমবার্গ কোড নামে অভিহিত মানবদেহে পরীক্ষার এইসব নীতি পরবর্তী সময়ে বিস্তৃততর রূপ নেয় ১৯৬৪ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চিকিৎসক সম্মেলনে। এই নীতিসমূহকে হেলসিংকি ঘোষণা [Helsinki Declaration) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ICMR ১৯৮০ সালে এ বিষয়ে "নতুন" নীতি প্রণয়ণ করেছে বলে যে ধারণা নাধারণ জন্মাতে চায়, তার প্রত্যেকটিই হেলসিংকি ঘোষণায় উল্লিখিত আছে। ভারত এই ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী, অর্থাৎ ১৯৬৪ সাল থেকেই এইসব নীতি ভারতীয় গবেষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভারতের মেডিক্যাল কাউন্সিল হেলসিংকি ঘোষণাকে বিবেচ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশানও পুস্তিকা প্রকাশ করে হেলসিংকি ঘোষণাকে ভারতীয় চিকিৎসা-গবেষকদের গোচরে এনেছে (IMA Pamphlet no. VI, Reprint May, 1975. 'Our Ethics—The Nation's Safety')। এই পরিপ্রেক্ষিতে ICMR-র এই নতুন [!] প্রচেষ্টায় সত্যিকারের নতুনত্ব তো নেইই, বরং সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয় যে ICMR-র নিজের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় সংঘটিত অমানবিক পরীক্ষা-দুটির সঙ্গে এবংবিধ তোড়জোড়ের একটা সংযোগ আছে।

হেলসিংকি ঘোষণাতেই বলা হয়েছে, মানুষের দেহে পরীক্ষার ব্যাপারে এই ঘোষণা পালনই যথেষ্ট নয়, প্রত্যেক গবেষককে তার দেশের আইনও মেনে চলতে হবে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আইনগত বাধা-নিষেধও আছে। ভারতে আছে Indian Drugs and Cosmetics Act, 1940, যাতে নির্দেশিত আছে যে মানুষের দেহে গবেষণায় ভেষজ-নিয়ামকের পূর্বসম্মতি আবশ্যিক, অন্যথায় ঊর্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান আছে। ১৯৭৪-৭৬ সালে ICMR-র কলকাতার অপ-পরীক্ষা আইন বিরোধীও ছিল।

ICMR-র আলোচ্য বিজ্ঞপ্তিটিতে ভারতীয় গবেষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে নীতিনির্ধারক কমিটির অনুমোদন না থাকলে তাদের কোন পরীক্ষায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুদান বা অন্য কোন সহযোগিতা করবে না। সবচেয়ে বেশী চমৎকৃত হতে হয় এই নির্লজ্জ বিজ্ঞপ্তির চরম পরিহাসে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৭৪-৭৬ সালের কলকাতার অপ-পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল এবং এই দুটি পরীক্ষাই ছিল নীতি-বিরোধী ও বেআইনী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কি জানত না যে হেলসিংকি ঘোষণা নামে পরিচিত কিছু নীতি সারা বিশ্বে প্রচলিত আছে? অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পত্রিকাতেই এই ঘোষণার বিস্তারিত বর্ণনা (১৯৭৫ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চিকিৎসক সম্মেলনের পরিবর্ধন সহ প্রকাশিত হয়েছিল (WHO Chronicle, 30, 1976, p 360-362)।

বিগত পাঁচ-ছয় বছর ধরে কলকাতার বিজ্ঞানীরা ICMR-র এই অপ-পরীক্ষাদ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের ভেষজ নিয়ামক নিশ্চুপ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর এতাবৎ দার্শনিক নির্লিপ্ততায় অবিচল। ICMR নিজেও এই অপকার্যে জড়িত নিজের বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি। তাই ICMR-র এই নতুন লক্ষঝক্ষপ্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেও ঘরপোড়া গরু আমরা সাধুবাদে উচ্চকণ্ঠ হতে পারছি না। আমাদের আশংকা থেকেই যায়, আমাদের বিজ্ঞানীদের চেতনায় পরিবর্তন না এলে, আমাদের বিজ্ঞানসংস্থাগুলির মধ্যযুগীয় গঠন ও কার্যকলাপের পরিবর্তন না হলে এসব উপদেশ কতটা কাজে পরিণত হবে।

এ প্রসংগে আমাদেরই প্রতিবেশী তৃতীয় বিশ্বের অন্য একটি দেশের অভিজ্ঞতা স্মরণ করার যোগ্য। ঢাকায় বাংলাদেশ SEATO-র যৌথ প্রচেষ্টায় কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটারী বলে একটি গবেষণাগার ছিল। সেখানে বিভিন্ন সময়ে কিছু অমানবিক গবেষণা হয়েছিল নিম্নবিত্ত মানুষের

উপর। প্রতিবাদ বন্ধ করার উপায়ও আবিষ্কৃত হল। "Eight months ago, an ethical review system which appears as good as any in the world was set up, but since there was an ethical review committee at the time the experiments in question were done, the critics are not convinced that the review process will work properly without radical changes in the organisation and objectives of the laboratory" (Lancet, April 8 1978).

অতঃপর আমার দেশেও বিদেশী স্বার্থে আমার উপর আমারই স্বজাতি বিজ্ঞানীর মাধ্যমে যে পরীক্ষা হবে, সেটি আর বেআইনী থাকবে না, রীতিনীতির ব্যত্যয়ও তাতে ঘটবে না, কারণ ICMR সেপথ বন্ধ করার উপায়ের সন্ধান দিয়েছে। অতএব মাভৈঃ, হে ভারতবাসী গিনিপিগবৃন্দ, তোমাদের জন্য ethical committee হচ্ছে, নিন্দুকের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে নিরুদ্বিগ্নমনা হও। ভুলিও না জন্ম হইতেই তোমরা (অন)-বিজ্ঞান তথা ব্যবসায়িক স্বার্থের নিকট বলিপ্রদত্ত।

সুখময় ভট্টাচার্য
13/4 সেন্ট্রাল পার্ক
কলিকাতা-700032

Experiments in Bangladesh

"The Cholera Research Laboratory (C.R.L.), set up in Dacca in 1960 by SEATO (South East Asia Treaty Organisation), is run under an agreement between the Government of U.S.A. and Bangladesh."

— Round the World. Bangladesh. Lancet January 28, 1978, p 202

"Experiments have been done at the C.R.L, which have paid little regard to the rights and needs of the subjects of the research and which have been done without informed consent.

The following experiments would not, in my opinion, have been passed by ethical committee elsewhere :—

a) Radioactive materials were given to cholera patients.

b) Tubes were passed through the entire intestinal tract from mouth to anus to measure "transmural electric potential" in cholera patients.

c) Biopsies were taken from jejunum and other parts of the intestine.

d) Proper treatment were withheld from patients in coma and suspected to have hypoglycaemia in order to test a hypothesis ; glucagon was given instead of intravenous glucose to see whether glycogen store were depleted. Liver glycogen was depleted and one patient died who might have survived with prompt adminstration of glucose.

e) Catheters were passed through the heart and into the pulmonary artery to study the haemodynamic effects of cholera and of different kinds of fiuid replacement.

f) When it was observed that there was a high incidence of cholera in villages downstream from the Cholera Hospital at Matlab, the first reaction was not to improve the sanitary problem, but use these villages as a place to test whether installation of tubewells would prevent cholera. The experiments was a failure. Subsequently, measures were introduced to prevent contamination of the water from the hospital.

— International Research Laboratory in Bangladesh. Colin McCord, Lancet, April 8, 1978, p. 768.

'বুদ্ধি' সম্পর্কিত কিম্বদন্তীর বিরুদ্ধে

১৯ ৬ সালে আমেরিকায় **'IQ Test'** মানুষের বুদ্ধি নির্ণয়ের উপায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকেই এর প্রয়োজনের যথার্থ ভিত্তি ও 'বুদ্ধি'র সঠিক সংজ্ঞা নিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। **IQ Test** যে বুদ্ধি মাপে না, এ বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদেরা তাদের সন্দেহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কাটিয়ে ওঠা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও নয়, কেননা ঐতিহাসিকভাবে যে প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই **test** করা শুরু হয়, সেই শ্রেণী-প্রয়োজন আজও বর্তমান। অতিসরলীকরণের ভুল না ক'রেও একথা বলা যায় যে, বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অনেক রসদের মতো, বুদ্ধি মাপার এই উপায়ও দরিদ্র দেশগুলোতে বহুদিন হ'ল আমদানী হয়ে গেছে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রবেশিকা বা চাকরীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো এর ভিত্তিতেই যোগ্যতা যাচাই করে তাদের **'goods specification'** পূরণ করেছে। মনস্তত্ত্ববিদরাও, কল-মালিকদের ক্রমপরিবর্তনীয় চাহিদা অনুযায়ী, একের পর এক **test** ডিজাইন করে, এই নির্ণয় পদ্ধতির ক্রম-বিকাশ ঘটিয়ে চলেছেন। এর ফলে শুধু যে আমাদের 'বুদ্ধি' [**Intelligence**] সম্বন্ধে ধারণা দিন দিন ভ্রান্ত প্রচার ও চিন্তা-ভাবনার শিকার হচ্ছে তাই নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশকেও তাদের সামাজিক অবস্থান ও সমাজ-বিকাশের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ সচেতনভাবে, অবুঝ রাখার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। তাই **IQ test** গুলো যথার্থই কী মাপে, তার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক কোথায়, মানুষের বিকাশে এই বুদ্ধির প্রয়োজ-নীয়তা কী এবং কোন্ ঐতিহাসিক প্রয়োজন থেকে এই **test**-এর উদ্ভব —মোটামুটি এই প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে আমরা কিছু কিছু দিকের উপর আলোকপাতের চেষ্টা করব।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, আমেরিকায় একদিকে যখন যথেষ্ট শিল্প পুঁজি জমে উঠার ফলে নগর কেন্দ্রিক বৃহৎ উৎপাদন শিল্পগুলো তাদের প্রামান্য উৎপাদন পদ্ধতি ও ক্রেতাদের চাহিদা নিয়ে গড়ে উঠছিল, অপর-দিকে তখনই জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ জীবিকার সন্ধানে নগরাভিমুখে আসা শুরু করেছিল। এই বৃহৎ-উৎপাদন শিল্পের মালিকরা এই সময়ে, নগরীকরণের ও বৃহৎ উৎপাদন সংক্রান্ত সব রকম জটিল সমস্যার ও বহুবিধ চাহিদার সম্মুখীন হতে থাকে। কিন্তু জটিল এই সমস্যাগুলোর সার্থক সমাধানে যে শিক্ষিত ট্রেনিংপ্রাপ্ত মধ্য-শ্রেণীর প্রয়োজন অনুভূত হয়, তার অনস্তিত্ব, কল-মালিকদের, তৎকালীন শিক্ষা ও রাষ্ট্রব্যাবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুন করে সাজিয়ে তুলতে বাধ্য করে। এর ফলস্বরূপই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গড়ে ওঠে **Rockfeller Educational Board** এবং **Carneige Institute of Washington**। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমেই বৃহৎ-পুঁজির মালিকেরা তৎকালীন শিক্ষানীতিগুলোকে তাদের প্রয়োজনানুসারে রূপ দিতে আরম্ভ করে এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি চালু করতে বাধ্য করে। সামগ্রিক উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদে এই সময়ে একদিকে যেমন তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে অর্থ বিনিয়োগ শুরু করে, অপরদিকে তেমনি শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে ও শ্রমকে সম্পূর্ণ **management**-এর অধীনে আনার উদ্দেশ্যে তারা সেই খাতেও অর্থ বিনিয়োগ শুরু করে।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই শুরু হয় বৃহৎ শিল্পের সাহায্যপ্রাপ্ত **testing movement**, যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অজুহাতে নির্বীজকরণ শুরু করে। বৃহৎ-পুঁজির মালিকদের থেকে তখন এই বলে সাহায্য নেওয়া হত যে, সমাজের খুনী, চোর, বেশ্যা—এরা হ'ল সবচেয়ে কম বুদ্ধিমান ও কাজের অনুপযুক্ত এবং সমাজের বোঝা হয়ে এরাই সমস্ত জটিল সমস্যাবলীর সৃষ্টি করছে। কাজেই এদের নির্বীজকরণ হ'লে মানুষের বিবর্তন কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রনে আনা যাবে অর্থাৎ কয়েক শতক পরেই সমাজে সবচেয়ে বুদ্ধিমানরাই শুধু থাকবে এবং এরাই পারে বৃহৎ পুঁজি ও শিল্পের মালিকানাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ সুনিশ্চিত ক'রতে। সর্বপ্রথম ইণ্ডিয়ানায়, ১৯০৭ সালে এই নির্বীজকরণ আইন পাশ করানো হয়, যা পরে আরও ৬৫ টা রাজ্যে পাশ হয়। সমাজ তখন শারীরিক-ভাবে পঙ্গুদের বাঁচার অধিকার কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয় না, সামাজিকভাবে কিঞ্চিৎ দুর্বলদেরও সমাজ থেকে অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ **Terman** 1916 সালে তার **"The Measurment of Intelliigence"** গ্রন্থে লেখেন"……**all feeble-minded are at least potetial criminals. That every feeble-minded woman is a potential prostitute would hardly be disputed by any one. Moral judgement, like business judgement, Social judgement or any other kind of higher thought process is a function of intelligence"**। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে এই **Terman** ভদ্রলোকই ১৯২২-২৩ সাল নাগাদ **'The New Republic'** পত্রিকায় **I. Q.** দিয়ে যে বিখ্যাত **'Lippman-Terman**

controversy' হয় তাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। Thorndike ও একইভাবে বুদ্ধিমানদের দীর্ঘায়ু করার উদ্দেশ্যে লেখেন "By selective breeding supported by a suitable envirnoment we can have a world in which all men will equal the top ten per cent of present men. One sure service of the able and good is to beget and rear off spring. One sure service which the inertia and vicious can perform is to prevent their genes from survival." [Human Nature & Social order, Thorndike]। সমাজের সর্বস্তরেই এই পৃথকীকরণ ও অপসারণ আন্দোলন শুরু হয়। ভাইনল্যাণ্ডের training স্কুলে প্রথম Binet-Simon স্কেলে I. Q. মেপে মানসিকভাবে পৃথকীকরণ করা হয়। এই ভাবেই I. Q. test তার দীর্ঘ পদযাত্রার সামাজিক সূচনা করে।

তৎকালীন সামাজিক কাঠামোকে corporate liberal state এর প্রয়োজনমাফিক গড়ে তুলতে ও তার ভিত মজবুত করতে অর্থাৎ, একদিকে এই তথাকথিত বুদ্ধিমান ম্যানেজারিয়াল (managerial) মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি ও অপরদিকে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীদের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের দ্বারা, এই মধ্য-শ্রেণীর বুদ্ধির দাপট প্রতিষ্ঠা ক'রতে এই যে আন্দোলন শুরু হয়, এরই এক অতিপ্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে বুদ্ধি সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণার প্রচার ও 'বুদ্ধি নির্ণয়ের' প্রয়োগ, ব্যাপক হারে আরম্ভ হয়। Thorndike, Goddard, Terman - এরা কেউই কিন্তু এর সামাজিক দিকগুলো সম্বন্ধে অবচেতন ছিলেন না। Goddard তো পরিষ্কার বলেই ফেললেন "The disturbing fear is that the masses—the seventy or even eighty six million—will take matters into their own hands". [Human efficiency and levels of intelligence, 1920, Goddard]। এই সময়কার প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই ভয়ের এই আভাস পাওয়া যায়। কাজেই ৪০ লাখ অবশিষ্ট বুদ্ধিমান মধ্যশ্রেণীর উপরই এই ৮৬০ লাখ লোকদেরকে সবরকম আন্দোলন বহির্ভূত পথে সঠিক নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব বর্তায়।

আজকে বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে, যখন এই শ্রেণী বিভাজন ও মধ্য শ্রেণীর নেতৃত্ব সমাজে স্থাপিত হয়ে গেছে এবং সমাজের উঁচু-নীচু প্রত্যেক স্তরেই এই বুদ্ধির কিম্বদন্তী তার সমস্ত শেকড় গভীরে প্রবেশ করিয়ে ভালমত গেড়ে বসেছে, তখন একেই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে আরও সুদৃঢ় ও মজবুত করা ছাড়া এই 'বুদ্ধিমান' দের আর কিছু করার না থাকাটাই স্বাভাবিক।

IQ যথার্থ ই কী মাপে :

IQ test-এ বিভিন্ন বয়সের লোকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। এই প্রশ্নমালা প্রস্তুতিতে নির্দিষ্ট কোনও নিয়মাবলী মেনে চলা হয় না। বিভিন্ন মনস্তত্ত্ববিদরা বিভিন্ন ধরনের প্রামান্য প্রশ্নাবলী তৈরী ক'রে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের বা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এগুলোর উত্তর সংগ্রহ করেন। কে কতগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর করতে পারছে, এর ভিত্তিতে প্রত্যেকের মানসিক বয়স নির্দ্ধারিত হয়, একে প্রত্যেকের দৈহিক বয়স দিয়ে ভাগ ক'র, সেই ভাগফলকে ১০০ দ্বারা গুন করে পরিমাপের 'বুদ্ধ্যঙ্ক' নির্ণীত হয়। বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের এই পদ্ধতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পরীক্ষা ব্যবস্থার মত, বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ে প্রযুক্ত প্রশ্নগুলোও, সাধারণভাবে একজনের বিভিন্ন ব্যাপারে দক্ষতারই সূচক, এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ, অঙ্ক সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি, একজন কত দ্রুত বিভিন্ন গাণিতিক ক্রিয়া করতে পারে, তার সূচক ; ভাষা সম্পর্কিত প্রতিশব্দ বা বিপরীতার্থক বা সমার্থক শব্দ লিখন, একজনের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানের ও দ্রুত স্মরণ ক্ষমতার সূচক। কাজেই 'বুদ্ধ্যঙ্ক' কখনই একটা সরলরৈখিক স্কেলে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদের তুলনামূলক পারদর্শিতার সূচক নয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ের ব্যক্তিদের কোন বিষয়ে দক্ষতারও সূচক নয়। আইনষ্টাইনের IQ-এর পরিমাপ নিউটনের বা প্ল্যাঙ্কের বা লেনিনের বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাপের সমান হ'লে যেমন তা কোনও কিছুই প্রমাণ করে না, ঠিক তেমনিই এঁদের প্রত্যেকের IQ-এর পরিমাপ পৃথক পৃথক হলেও তার থেকে কিছুই সিদ্ধান্ত করা যায় না। সবচেয়েগুরুত্বপুর্ণ কথা হ'ল যে, যে সমাজ ব্যবস্থায় চূড়ান্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অক্ষমতা বিরাজমান, সেই সমাজে এই পদ্ধতিতে কখনই সামাজিক পৃথকীকরণের কাজে প্রয়োগ করা চলে না। মনস্তত্ত্ববিদ্যাজ্ঞানের একটি অন্য বিভাগ হিসেবে শুরু হওয়ার পর্য্যায়ে, Binet এবং Simon যখন এই 'বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় পদ্ধতি' তৈরী করেন, তখন তারা এই দিকগুলো সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং এই পদ্ধতির ভুল প্রয়োগ হতে পারে জেনেই, এর প্রয়োগে সংকীর্ণ ক্ষেত্র ও সীমাবদ্ধতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মনস্তত্ত্ববিদদের সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের মনস্তত্ত্ববিদরা এই পদ্ধতির যথেচ্ছাচার প্রয়োগের নেশায় ও সংকীর্ণ স্বার্থের বশবর্তী হয়ে, মূল ধারণাগুলোকেই গুলিয়ে ফেলেন ; এবং জেনসেন প্রমুখের প্রচারিত 'বুদ্ধি' সম্পর্কিত কিংবদন্তীর জন্ম দেন ; কার্য্যকারণ সম্পর্ককে সম্পূর্ণ গুলিয়ে ফেলে, ধনীদের আরও ধনী হওয়া এবং গরীবদের আরও গরীব হওয়ার কারণ হিসেবে তাদের আপেক্ষিক 'বুদ্ধ্যঙ্কে'র পার্থক্যকেই দায়ী করেন এবং 'শোষণ' সম্পর্কিত প্রশ্নটিকে সুন্দরভাবে পাশ কাটিয়ে, শোষণভিত্তিক এই অন্যায় সমাজব্যবস্থার আপাতভাবে যুক্তিপূর্ণ একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করান ; জেনসেন প্রমুখদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী একথা বলতে হয় যে সমাজের সবচেয়ে বুদ্ধিমান অংশ অর্থাৎ শাসক শ্রেণী ও তার প্রতিনিধিরা, সামাজিক

বিপ্লবের পর, সবচেয়ে মুখ্য অংশে রূপান্তরিত হয়। এ ব্যাখ্যা অবশ্য IQ এর প্রবক্তারা গ্রহণ করবেন না।

সাধারণ অর্থে বা বৈজ্ঞানিক অর্থে আমরা 'বুদ্ধি' বলতে যা বুঝি তার সঙ্গে 'বু দ্ধ্যঙ্ক'-উদ্ভুত বুদ্ধি সম্পর্কিত অনৈতিহাসিক ও ইতিহাস বিরুদ্ধ ধারণার, কোনও সম্পর্ক নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী, মানব সভ্যতা কর্তৃক সাহিত্যে জ্ঞানভাণ্ডারের, কিয়দংশের অধিকারী হয়। বিকাশ-প্রক্রিয়ায় আক্ষরিক জ্ঞানের এই অংশই একজন ব্যক্তি মানুষের সামগ্রীক চেতনার উপাদান। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীগুলির এক একজন প্রতিনিধি হিসেবে, সেই শ্রেণীগুলির প্রত্যেক ব্যক্তি সদস্য, কিছু বিশেষ ও কিছু সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হয়, বিশেষ ও সার্বজনীন—এই দুই নিয়েই একজনের সামগ্রীক জ্ঞান গঠিত হয়। মানব সভ্যতা স্থিতিশীল নয় বলে, জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমবর্দ্ধমান এবং তার সঙ্গে তাল রেখে মানুষের চেতনাও ক্রমপরিবর্তনশীল। জৈবিক স্তরে ক্রিয়ারত বিবর্তনের বিভিন্ন কারণগুলি ছাড়াও সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সংগ্রাম এই পরিবর্তনশীলতার জন্য দায়ী। জৈবিক বিবর্তনের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ আজকের মানুষ ও তার মস্তিষ্ক, এবং বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সংগ্রামে ক্রমপরিবর্তনশীল ব্যবস্থার চূড়ান্তরূপে—আজকের জটিল সমাজ। আধুনিক মানুষের জটিল মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র, জটিলতর সমাজের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাতে বিবর্ত্তনশীল; শোষণভিত্তিক এই সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন হিন্দী সিনেমা, বাজারী সাহিত্য, বাজারী শিল্প-কলা প্রভৃতি দিয়ে mass-psychological conditioning চলে, অপর-দিকে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব জনিত কারণে প্রত্যেক স্তরে 'দুই বিরুদ্ধের সংগ্রামও চলে। 'বুদ্ধি', যথার্থ বৈজ্ঞানিক অর্থে মানুষের সামগ্রীক চেতনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং বিবর্তনশীল। বুদ্ধি দ্বারা মানুষের পেশা নির্দিষ্ট হয় না, পেশাগত অবস্থান দ্বারা মানুষের চেতনা নির্দিষ্ট হয়, এবং আংশিক অর্থে বুদ্ধিও। প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক বা অর্থনীতিবিদরা যে ইতিহাস-চেতনা রহিত নন, তার কারণ তাঁদের সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান· তাদের বুদ্ধির স্বল্পতা নয়।

প্রত্যেক মানুষ বৈশিষ্ট্যগতভাবে এক না হ'লেও মানব সভ্যতার বিধানপথে সঞ্চিত জ্ঞানের মৌলিক সারমর্মটুকু করবার ক্ষমতা সবারই আছে, অবশ্য একেবারে বিকৃত মস্তিষ্কের ব্যক্তিরা এর ব্যতিক্রম। বাস্তব-জগতে এর যে সীমাবদ্ধতা লক্ষিত হয়, তার কারণ জৈবিক নয়, ঐতি-হাসিক ও সামাজিক।

সহায়িকা

(1) The IQ controversy—edited by Ned Block & Gerald Dwakin.

(2) Race and IQ—edited by Ashley Montagu.

(3) Mankind Evolving— Dobzhansky.

কল্যাণ গুহ

Materials Science Centre (Science Education Group)

আই· আই· টি খড়্গপুর।

বার্ণালের আশীতম জন্মবার্ষিকী

বার্ণাল দিবস সংগঠনী কমিটি গত ২৬শে আগষ্ট সাহা ইনষ্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সভাকক্ষে বিজ্ঞানী জে· ডি· বার্ণালের আশীতম জন্মবার্ষিকী পালন করেন। একদিনব্যাপী এই সভায় প্রায় পাঁচশ শ্রোতা অংশগ্রহণ করেন। সভার গোড়ায় অধ্যাপক রমেন পোদ্দার, শিবব্রত ভট্টাচার্য ও এ, পি· পাত্র এই মর্মে বক্তব্য রাখেন যে বার্ণাল যেমন একজন প্রথম সারির বিজ্ঞানী ছিলেন তেমন তিনি আবার সমাজ ও বিজ্ঞানের সম্পর্কজনিত সমস্যাগুলির বিশ্লেষণেও ছিলেন অদ্বিতীয়।

সভার প্রথম অধিবেশনে বার্ণালের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের ডঃ রঞ্জিত সেন সিলিকেট ও অন্যান্য অজৈব অণুর গঠন নির্ণয়ে বার্ণালের কাজের আলোচনা করেন। স্টেরলের গঠন নির্ণয়ে বার্ণালের অসাধারন গুরুত্বপূর্ণ কাজের পর্যালোচনা করেন বোস ইনষ্টিট্যুটের ডঃ এস চৌধুরী। সাহা ইনস্টিট্যুটের ডঃ কে, ভি, মানি বলেন যে helix সদৃশ গঠন ও ট্রান্সকোপটাইড ইউনিটগুলির বিষয়ে প্রথম স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন বার্ণাল। সাহা ইনষ্টিট্যুটের ডঃ এস· কে· মজুমদার প্রোটিন কেলাস-বিজ্ঞান ও ভাইরাস বিষয়ে বার্ণালের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের পর্যলোচনা করেন। এরপর সাহা ইনষ্টিট্যুটের ডঃ বি, দত্তরায় কঠিন পদার্থের আংশিক বিশৃঙ্খল দশা হিসেবে তরলকে দেখে তরলের গঠন সম্পর্কে বার্ণালের তত্বীয় কাজের আলোচনা করেন। এঁদের সকলের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয় যে বার্ণালের মত বিরাট প্রতিভা বিজ্ঞানের ইতিহাসে খুব কমই দেখা গেছে।

বার্ণাল বিজ্ঞানের সামাজিক উৎস, ঐতিহাসিক বিকাশ, ও সমাজে বিজ্ঞানের ভূমিকা বিষয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। দ্বিতীয় অধিবেশনটিতে বিজ্ঞানের সামাজিক দিকগুলি নিয়ে তাঁর এই অবদানের উপর আলোচনা হয়। শ্রীদিলীপ বসু বার্নালের সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতিকথা পেশ করেন ও বিজ্ঞানের বিবর্তন বিষয়ে বার্ণালের বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন। সাহা ইনষ্টিট্যুটের ডঃ জয়ন্ত বসু সামাজিক অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের পরিকল্পিত প্রয়োগ বিষয়ে বার্ণালের বক্তব্য আলোচনা করেন। আশুতোষ কলেজের শ্রী অংশুতোষ খান বৃটেনের বিজ্ঞানকর্মী আন্দোলনে বার্ণালের অগ্রণী ভূমিকার পর্যালোচনা করেন। এর পর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যাপক জে· দত্তর সভাপতিত্বে শ্রী সুনীল মুখার্জী, শ্রীসুব্রত পাল ও শ্রীঅতীশ দাসগুপ্ত ভারতে বিজ্ঞান আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করেন। সুশীল মুখোপাধ্যায় জাতীয় স্তরে এই ধরনের আরো বড় আকারের সভার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

যে না মানে সে গাধা

কোন প্রবন্ধের নয়, উপরোক্ত শিরোনাম অভিনব এক প্রদর্শনীর। কাঁকুড়গাছির ইস্ট ক্যালকাটা সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন বা সংক্ষেপে ই. সি. এস. সি. ও. এর উদ্যোক্তা। কলকাতার কাঁকুড়গাছি ও ফুলবাগানের মোড়ে কুস স্কার বিরোধী এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল গত পূজোর সময়।

কথায় বলে –"হাঁচি টিকটিকির বাধা যে না মানে সে গাধা"। ই.সি.এস.সি ও র কর্মী ভায়েরা গাধা বনতে রাজি তবু হাঁচি টিকটিকির বাধা মানতে নারাজ। শুধু নিজেরাই নয় আর পাঁচজনকেও না মানাতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন। তুক্ তাক, তাবিজ, কবচ, জ্যোতিষ, ওঝা, সাইবাবারা সব ভুয়া এই ব্যাপারটা বোঝাতে চেয়েছে ওরা পোস্টার, কার্টুন ও ছোট-খাটো পরীক্ষার মাধ্যমে। এদের সবশেষ পোস্টারের সর্বশেষ লাইনে লেখা ছিল—"আমাদের গাধা বললে অবশ্য মুশকিলে পড়বেন আপনারাই কেননা তাহলে কোপার্নিকাস গ্যালিলিও ব্রুনোদেরও যে গাধা বলতে হয়, সহজেই অনুমেয় ওদের লক্ষ্য আমাদেয় দেশের বিশাল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষেরা নন কারণ তাঁরা জন্মেও শোনেন নি গ্যালিলিও ব্রুনো বা কোপার্নিকাসের নাম। ওদের এই "আপনারা" তারাই যারা একাধারে শিক্ষিত নামের দাবীদার আবার হাঁচি টিকটিকি সাঁইবাবাদের মদতদার।

এ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য কি জানতে চাওয়ায় ওদের চটপট জবাব—'যে রঙেরই হোক বেবাক দলের পল্টু নাল্টু খোকন কানুদের সব হাঁকডাকই অরন্যে রোদন হবে যদ্দিন না নিজেদের এবং আমাদের চার-পাশের মানুষগুলোর মন থেকে ঝেড়ে সাফ করা যায় এমন সব অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের এঁঠেল ময়লাগুলো'। ওদের এই কুসংস্কার নিয়ে ছবিগুলোর ফাঁকেও হাজির দেখলাম মানুষেয় রুজি রোজগার বাঁচা মরার প্রশ্নগুলো। সব কিছুতেই 'তাতে কি হয়েছে'—এমন মানসিকতার লোকেদের মনের কোনের প্রশ্নটাকে তুলে ধরে নিজেরাই দিয়েছে তার উত্তর। যেমন'... হাজার হাজার লোকের মনের বিশ্বাস (তা যত উদ্ভটই হোক) যদি ন্যাবার মালায় জন্ডিস সারে বা প্যান্টের হিপ পকেটে কালীমায়ের পায়ের তলার জবার মালার কুঁচো গুঁজে চাকরীর হিল্লে হয় অবথা হাতের কেড়ে আঙুলে কিংবা অনামিকার গোড়ায় একখানা পাথর সেঁটে বাসের চাপাপড়া ঠেকানো যায় তাতে আপত্তি কিসের'?—ওদের জবাব "...ঠিক এইখানেই আমাদের আপত্তি"। দৈবনির্ভরতার বেনো জলে ভাসিয়ে নিয়ে যায় মানুষের আত্মবিশ্বাস। সেই আত্মবিশ্বাস খোয়া মানুষেরা পরে ন্যায়ের পক্ষে লড়াইয়েও হয় পিছপা। "...তখন ন্যায্য দাবী না মিটলেও বা অন্যায়ভাবে চাকরীতে ছাঁটাই হলেও অথবা এমন কি মা বোনেদের ইজ্জত নিয়ে টান পড়লেও, এর বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে ছুটবে এরা ওঝা, পুরোহিত বা জ্যোতিষদের কাছে প্রতিবিধানের আশায়।...তাই আমাদের আপত্তি"।

কতই বা এদের বয়স—এই আঠারো থেকে ছাব্বিশ। এরই মধ্যে অনেকখানিই আত্মস্থ করেছে সমাজ সভ্যতার নিয়ম প্রকৃতি। একদিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বুঝতে চাইছে সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিষয়গুলি, অন্যদিকে বহমান ঘটনাস্রোতের বাঁকে বাঁকে নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ঝালিয়ে নিতে চাইছে নিজেদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফারাকটুকু তাই এদের কর্মসূচীতে আছে যেমন বক্তৃতা, আলোচনা, বিতর্ক ও প্রবন্ধপাঠের শিক্ষামূলক আসর তেমনি আছে নিজেদের ধ্যান-ধারণা জনসমক্ষে হাজির করতে পোস্টার, কার্টুন, মডেল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। এদের বিষয়সমূহ খুবই বৈচিত্র্যময়। যেমন, দেশে বন্যা হলে ওরা খতিয়ে দেখে 'কেন এমন হল'। বিদ্যুৎ সঙ্কটের মুখে সাধারণ মানুষ যখন ধ্যুৎ-ধ্যাৎসব শব্দে বিরক্তি প্রকাশে ব্যস্ত তখন ওরা পাহাড় প্রমাণ তথ্য-সংগ্রহ করে দেখিয়ে দেয় 'আগামী দিনগুলো আরও ভয়ঙ্কর'। পূজোর সময় ঝলমলে আলোর সজ্জায় মানুষ যখন তন্ময়, তখন তাদের ঘোর কাটাতে হাজির করে 'দেবীপূজার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস' বা 'স্বরস্বতী মূর্তির বিবর্তনের ধারা'। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীও বাদ পড়ে না! চারদিকে শক্তি সমস্যা নিয়ে যখন চলছে হাঁকডাক তখন ওরা ছোটখাটো মডেলের সাহায্যে মানুষকে বোঝাচ্ছে শক্তি কি, কি তার উৎস, রূপান্তরের প্রক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। আবার বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে যে মানবসভ্যতার সংকটও ঘনিয়ে আসতে পারে সে বিষয়েও সচেতন ওরা। তাই সংক্ষেপে তুলে ধরে বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীগুলির মারণাস্ত্র নির্মাণে বল্গাহীন প্রতিযোগিতার তথ্যবহুল চিত্র। আর এই ধরণের কর্মসূচীর সাম্প্রতিকতম সংযোগ কুসংস্কার নিয়ে এই প্রদর্শনী—"যে না মানে সে গাধা"।

খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অনাড়ম্বর সব প্রয়াস। কিন্তু প্রত্যয়ে ঘাটতি নেই এতটুকু। এবারকার প্রদর্শনীতে একটি পোস্টারের হেডিং –'বাঁদরের সম্পত্তি হবে'। বিষয়—হস্ত রেখার ছাপ বিচার করে এক জ্যোতিষাচার্যের ঘোষণা—'জাতকের হাতে সম্পত্তির যোগ দেখা যায়'। পরে জানাচ্ছে ওটা একটা বাঁদরের হাতের ছাপ। পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছে একজোড়া হাতের ছবি—হাতে কালি মাখিয়ে সাদা কাগজে তোলা। একখানা এক ভদ্র বাঁদরের আর অন্যটা ভদ্রলোকের। কোনটা কার বলে না দিলে ধরে কার সাধ্যি!

এদের যোগাযোগের ঠিকানা—ইস্ট ক্যালকাটা সোশিও কাল্‌চারাল অর্গানাইজেশন, ১৩৪, রাজা রাজেন্দ্র মিত্র রোড, কলিকাতা-৭০০০১০। যোগাযোগের সময় প্রতি শনিবার সন্ধ্যা।

রবীন চক্রবর্ত্তী

পরিক্রমা

আর একটি রিয়্যাক্টর দুর্ঘটনা : রাজস্থানের পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের [সংক্ষেপে RAPP] এক নম্বর ইউনিটে একটি বিপজ্জনক ছিদ্র দেখা দিয়েছে। সূত্রে প্রকাশ, তেজস্ক্রিয়তার এই বিপদটি সৃষ্টি হয়েছে শেষ আচ্ছাদন [**shield**] ও ক্যালেণ্ড্রিয়ার [**calendria**] মাঝে, যেখানে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। অদূরদর্শী ব্যবস্থাপনাই নাকি এই পরিস্থিতির কারণ। খবরে প্রকাশ, অনেকগুলি প্রশমক তাপবিনিময় নলে [**moderator heat exchange tube**] গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিলো। বিকিরণের বিপদের জন্য মাসখানেক আগেই এই ইউনিটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দু'নম্বর ইউনিটের তাপবিনিময় নলেও ফাটল ধরেছে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

উক্ত সূত্রটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে যে, যেখানে নিরাপত্তা সমিতি দু নম্বর ইউনিট থেকে ৮০ মেগাওয়াটের বেশী শক্তি উৎপন্ন না করার জন্য সাবধান করে দিয়েছে সেখানে কর্তৃপক্ষ ২৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতা তৈরীর পরিকল্পনা নিচ্ছেন। যদিও নির্মাণ পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ইউনিটের কার্যক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট, তবুও শক্তিকেন্দ্রের কিছু জায়গায় পর্যাপ্ত বিকিরণরোধী আবরণ না থাকায় বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয়তার সম্ভাবনা আছে বলে নিরাপত্তা সমিতি শক্তি উৎপাদন কমাতে বলেছিলেন।

এদিকে পরমাণু শক্তি শাখার (সংক্ষেপে **DAE**) এক মুখপাত্র স্বীকার করেছেন যে এক নম্বর ইউনিটে ছিদ্র সৃষ্টির জন্য ওটা বন্ধ করা হয়েছে। তবে তাঁর মতে লঘু জলের [**light water**] জন্যই এটা হয়েছে এবং সেহেতু বিকিরণজনিত কোন বিপদের আশংকা নেই। দিল্লীর সরকারীসূত্রে বলা হয়েছে যে ছিদ্রটি 'খুবই ছোট'। আশা করা হচ্ছে যে ছিদ্রটি বন্ধ করতে সপ্তাহ তিনেক সময় লাগবে এবং ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে আবার কাজকর্ম চালু হবে। দুটি সরকারী সূত্র ২নং ইউনিটের সাময়িক বন্ধ হওয়ার খবর অস্বীকার করেছে।

বিদ্যুৎচিত্র, নানান তথ্য : কলকাতা হাইকোর্ট নিয়োজিত রাজ্যের বিদ্যুৎ সমস্যা তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট মাননীয় বিচারপতির কাছে সম্প্রতি পেশ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে রাজ্যের বিদ্যুৎ চিত্রের চমকপ্রদ সব তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে যেখানে মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার ২২৬·৩৭ ও ২৪২·৫০ কিলো ওয়াট আওয়ার পশ্চিমবঙ্গে সেখানে মাত্র ১৪·২৩ কি-ও-আ। বিগত দশকে গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, এমনকি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬·৫, ৪·০ এবং ৪·২ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গেএর মান ছিল সবচেয়ে কম মাত্র ০·৩ শতাংশ [আজকাল ৩।১০।১৯৮১]। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকেই কি কেন্দ্রীয় সরকার ও কি রাজ্য সরকার নির্বিশেষে বিদ্যুৎ শিল্পখাতে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যের চাহিদা কি হারে বেড়েছে, সেদিকে মনোনিবেশ করা হয়নি, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কোনরকম সুষ্ঠু পরিকল্পনাও ছিল না। অবশ্য বর্তমান রাজ্য সরকার এই বাজেট বরাদ্দ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবুও বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের বহর বেড়েছে। অচিরেই এই বিদ্যুৎ রহস্যের সন্ধান হওয়া দরকার। রাজ্যের অন্ধকার আর কতদিনে ঘুচবে ?

ক্যানসার : কবিরাজি দাওয়াই। মধ্যপ্রদেশে রায়পুরের এক কবিরাজ ক্যানসারের এক কবিরাজি ওষুধ তৈরী করে শহরে খুব হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন। তিনি নাকি ষাট বছর বয়স্কা এক ভদ্রমহিলার উপর এই ওষুধ সাতদিন প্রয়োগ করে জরায়ুর [**Uterus**] ক্যানসার সম্পূর্ণ সারিয়ে দিয়েছেন। শহরের ক্যানসার চিকিৎসক মহল নাকি এর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন [যুগান্তর ২৯।৯।৮১] অবশ্য এ সম্পর্কে মধ্যপ্রদেশ সরকার রায়পুর ক্যানসার ইউনিটের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ টি কে, ব্যানার্জীর এক বিবৃতি প্রচার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ঐ সাতদিনে ভদ্রমহিলার ক্যান্সার কিছুটা উপশম হয়েছে বটে, একেবারে সেরে যায়নি, আগের রেডিয়েশন ট্রিটমেণ্টের দরুণই এই উপশম সম্ভব হয়েছে ; তিনি ক্যানসারের কবিরাজি দাওয়াইয়ের সম্ভাবনা একেবারেই বাতিল করে দিয়েছেন (স্টেটসম্যান ৫।১০।৮১)।

ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রচারের আগে সরকার ও বিজ্ঞানী মহল থেকে সত্যতা যাচাইয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয় না কি ?

ক্যানসার ও হোমিওপ্যাথি। ভূপালে সরকার স্বীকৃত হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথি হসপিটাল এণ্ড রিসার্চ মেডিকাল ইনষ্টিট্যুটের চিফ মেডিকাল অফিসার ও সেখানকার হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ এম. ই, খান ক্যানসার নিরাময়ের এক চমকপ্রদ দাবী করেছেন। তিনি নাকি গত ১৫ বছরে গলা ও হাড়ের ক্যানসারের ২৫ জন রোগীর ৭০ শতাংশের রোগ সারিয়ে দিয়েছেন। বোম্বের টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালে ১৯৭৬ থেকে ৭৮ সাল অবধি ৩ বার অস্ত্রোপচার করেও জনৈক রোগীর হাড়ের ক্যানসাড়ের বিস্তার রোধ করা সম্ভব হয়নি। তিনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রয়োগ করে ক্যানসারের কোষগুলিকে একটি

নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ রাখতে ও চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়তে দিতে সমর্থ হয়েছেন [পরিবর্তন ১৬।৯।৮১]। তিনি বলেছেন, সপ্তাহে এক ডোজ 'ডাইলুটেড কারসিনোসিন' (carcinocin) খেলে ক্যান্সার ভালো হতে পারে। অবশ্য রোগীকে দইসহ হালকা নিরামিষ খাবার খেতে হবে এবং ক্যাফিন আছে এমন সফট্ ড্রিংক যেমন চা ও কফি, এবং অ্যালকোহল বাদ দিতে হবে (ঐ)। ক্যানসার সারানোর ব্যাপারে এর আগে যে অসংখ্য ভিত্তিহীন দাবী হয়েছে, এটিও সেরকম কিনা তা অবশ্য জানতে আর একটু সময় লাগবে।

কলকাতায় সম্প্রতি কয়েক বছর চিত্তরঞ্জন ন্যাশানাল ক্যানসার রিসার্চ ইনষ্টিট্যুটের অধিকর্ত্রী ও এক গবেষকের ক্যানসারের ওষুধ 'সিকাফেক' আবিষ্কার নিয়ে কাগজে খুব হৈ চৈ করা হয়। অবশ্য এখনও পর্যন্ত এর কোনই সুফল প্রমাণিত হয়নি।

তা হোক, তবু এই অভাগা দেশে কিছু 'গুণীজনের' প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হল বই কি।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড দূষণ ও পশ্চিমী প্রকৃতিবাদ। স্টকহোমে এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে বিশ্বের আবহাওয়াবিদদের অধিকাংশের মত নিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দূষণ সম্পর্কে একটি দলিল তৈরী করা হয় (স্টেটস্‌ম্যান, ৯।২।৮১)। এতে বলা হয়, আগামী ৫০ বছরে মূলতঃ কয়লা, ও খনিজ তেল দহন (ও অরণ্য সংকোচনের) দরুণ বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে (বাতাসে কার্বন-ডাই অক্সাইডের বর্তমান উপস্থিতি দশ লক্ষ ভাগে ৩৩৪ ভাগ)। এর ফলে, পৃথিবীর আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। আগামী ৫০ বছরে আমেরিকা, রাশিয়া ও কানাডার উর্বর শস্যক্ষেত্র শুকিয়ে যাবে; ঐসব অঞ্চলের উষ্ণতা গড়ে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে যাবে। অন্যদিকে উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, ভারত, মেক্সিকো ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় বৃষ্টিপাতের ধারার অনুকূল পরিবর্তন ঘটবে। ফলে এই সব অঞ্চলে শস্যোৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাবও পড়বে—দেশে দেশে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অস্থিরতা উত্তর ও দক্ষিণের দ্বন্দ শুরু হয়ে যেতে পারে।

২০২৪ সাল নাগাদ কার্বন-ডাই-অক্সাইড দূষণে চীনসহ তৃতীয় দুনিয়া শতকরা ৫০ ভাগ এবং পশ্চিমী দুনিয়া মাত্র ২০ ভাগের জন্যে দায়ী থাকবে। তাই ঐ দলিলে বলা হয়েছে ধনী রাষ্ট্রগুলি তৃতীয় দুনিয়ায় খনিজ তেল ও কয়লার প্রকল্প গুলিতে বিদেশী সাহায্য বন্ধ করে দিতে পারে ও শক্তির বিকল্প উৎসের জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। একটি আমেরিকান রিপোর্টে এই মর্মে আহ্বানও জানানো হয়েছে—আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র এখনই পরিবেশ দূষণের উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ চায় (ঐ)।

তাহলে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি কি এখন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের দখলে?

পশ্চিমী প্রকৃতিবাদী বিজ্ঞানীরা ১৯৭২ সালেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকেই শ্লোগান তোলেন, মানুষ বাঁচাতে প্রকৃতি বাঁচাও এদের অবিরাম প্রয়াসে প্রায় ১০০টি দেশের ৪৫০টি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং ৭০০জন বিজ্ঞানী ১৯৭৭-৭৮ সালে প্রকৃতি সংরক্ষণে এক আন্তর্জাতিক প্রকল্পের রূপরেখা তৈরী করে ফেলেন। প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানে বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক লগ্নিকারী সংস্থা এগিয়ে এলেন [যুগান্তর ৬।৭।১৯৮১]। ভারতে গ্রামীণ অরণ্য সৃষ্টির জন্যে IDA উত্তর প্রদেশকে সাড়ে চার কোটি ডলার দিয়েছে; পশ্চিমবঙ্গেও ৩৩ কোটি টাকার অরণ্য প্রকল্পে অংশীদার হতে বিশ্বব্যাঙ্ক সম্মতি জানিয়েছে (ঐ)। এখন প্রশ্ন হল, কার্বন-ডাই অক্সাইড দূষণ থেকে বিশ্বের বিপর্যয় রোধে পশ্চিমী প্রকৃতিবাদে আমরা কতটুকু গুরুত্ব দেবো।

শিল্পজনিত পরিবেশ দূষণ ভারতে শিল্প নগরীগুলির পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিকই—তার জন্যে এখনই প্রতিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার—তবে সুবিশাল গ্রামাঞ্চলে তেমনটি নয়। তাই পশ্চিমী প্রকৃতিবাদীদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে খাদ্য ও বাসস্থানের মত প্রাথমিক সমস্যার গুরুত্ব কম করে দেখে পরিবেশ দূষণ নিয়ে সোরগোল তোলা ঠিক হবে কি?

কলকাতার শব্দ দূষণ বাড়ছে। কলকাতার নগর-সভ্যতায় কোলাহলের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। গাড়ীর শব্দ, কলকারখানার আওয়াজ, ক্রমবর্দ্ধমান মানুষের কলরব ইত্যাদি মিলিয়ে এই শহরের পরিবেশ এক-রকমে দূষিত হয়ে পড়ছে। এই শব্দ দূষণে স্নায়বিক বিকার, মানসিক বৈকল্য এমনকি মস্তিষ্কের বিকৃতি পর্যন্ত ঘটতে পারে; এছাড়া বধিরতা, আলসার, রক্ত-চাপ বৃদ্ধি ও হৃদযন্ত্রের অসুখও সৃষ্টি করতে পারে। গভীর রাতে ফিসফিস আলাপে ২০ ডেসিবেল শব্দই যথেষ্ট (দুটি শব্দের মধ্যে ১ বেল পার্থক্য বলতে বোঝায়, একটি অপরটির চেয়ে দশগুণ বেশী প্রবল; ১ বেল = ১০ ডেসিবেল)। শব্দ যখন ৭০ ডেসিবেলে ওঠে, তখন কথা শোনাতে বা শুনতে কষ্ট হয়। ৮০ থেকে ৯০ ডেসিবেলে এই অসুবিধার মাত্রা বেড়ে যায়; আরও উর্দ্ধের অবস্থা কল্পনার অগোচরে। অথচ কলকাতায় পূজামণ্ডপে উচ্চ-গ্রামের মাইক নিঃসৃত শব্দের পরিমাপ ৯০ থেকে ১০০ ডেসিবেলের মতন। এই ঢক্কা-নিনাদের মধ্যে অনেকক্ষণ কাটালে মস্তিষ্ক বিকৃতির আশঙ্কা থেকে যায়।

আরেকটি বিজ্ঞান পদযাত্রা: কলকাতায় ২রা আগষ্টের বিজ্ঞান মিছিলের (বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) পর আরেকটি বিজ্ঞান পদযাত্রা হয়ে গেল সরশুনা থেকে বেহালা ট্রাম ডিপো অবধি। সময়টা ছিল ২০শে সেপ্টেম্বর রবিবারের সকাল। 'আচার্য সত্যেন বসু বিজ্ঞান সংসদ' সংস্থা এই বিজ্ঞান-পরিক্রমার আয়োজন করে। বক্তারা পথ-পরিক্রমার বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশ দূষণ ও সাধারণ মানুষের কর্তব্য, মৃত্যুর পরে চক্ষুদান, স্বেচ্ছায় রক্তদান ও জনস্বাস্থ্যের নানান দিক সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন (যুগান্তর ১৬।৯।৮১)। ষাটে নয়, সত্তরে নয়, এই আশির দশকের শুরুতে এই রাজ্যের বিজ্ঞান আকাশে কয়েকটি বিজ্ঞান মিছিল চমক সৃষ্টি করছে। এদের ভালো-ভাবে অনুধাবন করা দরকার।

তবু বলি, এ রাজ্য বিজ্ঞান মিছিলে কল্লোলিণী হয়ে উঠুক। সত্যিকারের বিজ্ঞান আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক।

'সন্ধানী'

দানিকেনের বিভ্রান্তি ঃ

সমীরণ মজুমদার : মৌসুমী প্রকাশনী, কলিকাতা-৯ (১৯৮১)। দাম : কুড়ি টাকা।

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এরিখ্ ফন্ দানিকেন জার্মান ভাষায় তাঁর প্রথম বই Erinnerungen an die Zukuft প্রকাশ করেন। পরের বছর Chariots of the gods-was god an astronaut নামে বইটি ইংরেজীতে অনূদিত হয়। পরবর্তী সময়ে পর পর বেশ কয়েকটি বইএ দানিকেন তাঁর বক্তব্য বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত করেন। দানিকেনের প্রতিপাদ্য বিষয় মোটামুটি ভাবে এই—অতীত কালে পৃথিবীতে অপার্থিব কিছু উন্নত প্রাণী পদার্পণ করেছিল। পার্থিব পুরাকীর্তিতে এই ঘটনার বহু 'চিহ্ন' 'সাক্ষ্য প্রমাণ' ছড়ানো আছে। তাদেরকেই প্রাচীন পার্থিব মানুষের দেবতা বলে মনে করেছিল। তারা এক ধরণের 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং' করে উন্নত মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিসম্পন্ন আধুনিক মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে বেশ কিছু কুহেলিকাময় অতীন্দ্রিয়বাদও তিনি তাঁর বক্তব্যে পেশ করেছেন।

প্রথম বইটিতে দানিকেন বেশ কিছু প্রাচীন এবং রহস্যময় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে সেগুলোকে অপার্থিব নভশ্চরদের পৃথিবীতে আগমনের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। ঐ সমস্ত নিদর্শনগুলো সম্পর্কে আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতামত নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। প্রথম বইটীর ভূমিকায় দানিকেন লিখেছিলেন যে বইটী লিখতে তাঁকে যথেষ্ট সাহসী হতে হয়েছে। পরের বইগুলিতে তাঁর এই 'সাহস' দুঃসাহসে পরিণত হয়েছে এবং প্রথম বইয়ের আপাত 'বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ'এর বাহ্য খোলসটী বিসর্জন দিয়ে বিজ্ঞ ঋষিজনোচিত ভঙ্গিমায় মানবজাতিকে গুরুগম্ভীর মহান জ্ঞান প্রদান করেছেন।

'দানিকেনের বিভ্রান্তি' বইটীতে সমীরণ মজুমদার দানিকেনের বক্তব্যের অসঙ্গতি, স্ববিরোধ ও বিজ্ঞানের বিচারে ভ্রান্তি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সমীরণবাবুর প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আলোচ্য বইটীর ছয়টী অধ্যায়ের প্রথম চারটীতে দানিকেনের বক্তব্যের বিবরণ ও বিজ্ঞানের বিচারে দানিকেনের 'প্রমাণ' গুলোর স্থান কোথায় তা বিশদভাবে দেখিয়েছেন। লেখক অবশ্য ভূমিকায় এরূপ প্রচেষ্টাকে 'ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছেন। কথাটা হয়তো কিছু পরিমাণে সত্য ; কারণ কোন বক্তব্যের সত্যাসত্য বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করতে হলে আলোচ্য বক্তব্যটীর কিছু লক্ষণযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ কিছু পরিমাণে তথ্যভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন দানিকেনের অধিকাংশ 'বাণী'র এই লক্ষণগুলি নেই। অথচ দানিকেনের আপাত বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীর স্বরূপ উন্মোচন করা এবং দানিকেনের'প্রমাণে'র অন্যতম বিপরীত চিত্র দেখানোর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম চার অধ্যায়ের এরূপ প্রয়োজনে বেশ কিছুটা সিদ্ধ হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রসঙ্গ ভিন্নতর। দানিকেনের মতবাদের বিভ্রান্তির আলোচনায় এরূপ প্রসঙ্গের প্রাসঙ্গিকতা বিচার্য বিষয়।

আমাদের ছায়াপথ বা অন্য ছায়াপথের কোন নক্ষত্রে আমাদেয় সৌরজগৎ সদৃশ কোন গ্রহমণ্ডলী রয়েছে কিনা, থাকলেও তাতে মানব-সদৃস কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে কিনা এবং তাদের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের সম্ভাবনা কেমন ইত্যাদি নিয়ে বহু তথ্যনিষ্ঠ, ঐকান্তিক বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। ভিন্ন সৌরজগতের বুদ্ধিমান প্রাণীদের পৃথিবীতে আগমনের সম্ভাবনাও আলোচিত হয়েছে। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক আগরেষ্ট এ সম্ভাবনার কথা আলোচনা করেছেন (সমীরণ বাবু একথার উল্লেখ করেছেন) এবং বাইবেলে কথিত সোদাম ও গোমোরাহ

উড়ন্ত চাকী ঃ ইউ. এফ. ও
(Unidentified Flying Objects)

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাতে উড়ন্ত চাকী দেখা যায় ও এর পর ইউরোপ ও আমেরিকায় উড়ন্ত চাকী দেখার ধুম পড়ে যায়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বিমানবাহিনীর এক বৈজ্ঞানিক উড়ন্ত চাকীর পেছেনে ধাওয়া করে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে বিমানটিতে অক্সিজেনের ব্যবস্থা ছিল না এবং বৈমানিকটি আমেরিকার নৌবাহিনীর ১০০ ফুট ব্যাসের একটি বেলুন দেখেছিলেন) এর পরে প্রায় ১২০০০টি উড়ন্ত চাকী দেখার ঘটনা ঘটে ও ৫০টি বই এবং প্রায় ২৫০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে U. S. Air Force-এর আনুকুল্যে এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পদার্থবিদ্ E. U. Condon এর নেতৃত্বে U. F. O, অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ৫৯টি অনুসন্ধানযোগ্য ঘটনা গ্রহণ করে এবং ৩৭ জন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে অংশ নেন। কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টে অধ্যাপক E. U. Condon ইউ. এফ. ও'র দর্শনের সঙ্গে অপার্থিব প্রাণীদের যোগাযোগের কথা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ সম্পর্কে আর কোন অনুসন্ধানের দরকার নেই বলে মন্তব্য করেন।

নগরী ঈশ্বর কর্তৃক ধ্বংসের ঘটনাটা প্রকৃতপক্ষে নিউক্লীয় বোমা বিস্ফোরণ কিনা তা যাচাই করার জন্য তিনি কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার কথা বলেছেন। সাম্প্রতিক কালে উড়ন্ত চাকী বা ইউ. এফ. ও নিয়ে আমেরিকাতে যথার্থ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু দানিকেনের মত কেউ সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করে একের পর এক বক্তব্যের সৌধ নির্মাণ করার মত অপকার্যটি করেননি। দানিকেনের মতবাদের মূল ত্রুটি এইখানেই। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে দানিকেনের মতবাদ যথেষ্ট আলোচিত হচ্ছে। একদল দানিকেনের মতবাদের 'আলোকে' মহাভারতের কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকে উন্নত, শক্তিশালী ও সাম্রাজ্যবাদী অপার্থিব প্রাণীদের প্রাচীন ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টারূপে দেখতে পাচ্ছেন, অন্যদল দানিকেনের মতবাদে অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে এতে ভাববাদের আবির্ভাব, চিন্তার জগতে নৈরাজ্য ইত্যাদি নিয়ে চিন্তিত হচ্ছেন। দানিকেনের মতবাদ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ধোপে টেঁকে না; বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব যেভাবে স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলোকে নিক্তির ওজনে বিচার করে, দানিকেনের মতবাদে এরূপ কিছুই হয়নি। দানিকেনের গ্রন্থগুলোতে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। দানিকেনের মতবাদ আলোচনার ক্ষেত্রে এটাই বোধহয় প্রধান বিচার্য বিষয় হওয়া উচিৎ। দানিকেনের মতবাদ অ-মার্কসীয় কিনা তা কতখানি প্রাসঙ্গিক? অতীতের পৃথিবীতে আটলান্টিস মহাদেশ ছিল কিনা তার আলোচনায় এর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই প্রধান বিচার্য, আটলান্টিস এর অস্তিত্ব মার্কস্-সিজম এর স্বপক্ষে না বিপক্ষে এ কথা তো আসে না।

বইটিতে সামান্য কিছু কিছু বিজ্ঞানের ভুল চোখে পড়েছে। যেমন ১০৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'গতিশীল অবস্থায় ফোটনের ভর শূন্যের কাছাকাছি'; ফোটনের ভর বলতে যা বোঝায় তা সব সময়েই শূন্য। তা সত্ত্বেও ফোটনের ভরবেগ রয়েছে এবং তা ফোটনের শক্তির সঙ্গে বাড়ে। ১০৭ পৃষ্ঠায় সসীম আর অসীম শক্তির আলোচনা যথার্থ নয় মনে হয়েছে। ১০৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ট্যাকিয়নের ভর ইলেকট্রনের ভরের $১০^{১০}$ ভাগের এক ভাগ। বস্তুতপক্ষে ট্যাকিয়নের ধর্মবিশিষ্ট কোন কণার স্থিতিভর বাস্তব নয় কাল্পনিক (Imaginary)। ২৩৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'বিদ্যুৎচুম্বক তরঙ্গ হল ক্ষেত্র, ফোটন হল ক্ষেত্রকণা' একে পদার্থের পঞ্চম অবস্থা বলা যেতে পারে, আর নিউট্রন হলো পদার্থের ষষ্ঠ অবস্থা - এ সমস্ত বর্ণনা মোটেই সঠিক নয়।

ছাপা বাঁধাই ও কাগজের তুলনায় কুড়ি টাকা দাম একটু বেশি মনে হয়েছে।

ব্রহ্মানন্দ দাসগুপ্ত
সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।

কে কোথায় কি করছেন কি করবেন

ইউথ হোস্টেলস এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া : এদের দক্ষিণ কলকাতা জেলা শাখার উদ্যোগে আগামী ২৩শে থেকে ৩০শে ডিসেম্বর অবধি রাঁচী থেকে ৫৮ কিঃ মিঃ দূরে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের কাছে ডুলি জঙ্গলের নাকটা পাহাড়ে একটি প্রকৃতি পাঠ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ১০ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েরা এতে যোগ দিতে পারবে। গাড়ীভাড়া বাদে মাথাপিছু খরচ ৭৫ টাকা। শিক্ষাসূচীর মধ্যে আছে গাছ-গাছড়া চেনা, প্রকৃতি পরিচয়, ম্যাপ পাঠ, আকাশ চেনা ইত্যাদি। যোগাযোগের ঠিকানা ও সময়: (১) প্রমথনাথ সেন, ১০, লেক রেঞ্জ, কলি-২৬। বুধবার ও শনিবার সন্ধ্যায়; (২) কল্যাণ মজুমদার, ৭৭, সাদার্ন এভিনিউ, কলি-২৯। রবিবার সকাল।

সৃজনী : মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষদের সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী তাদের কর্মকুশলতা বিকাশ এবং স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তার অঙ্গীকার নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আগামী ১৪ই নভেম্বর পার্কসার্কাসের মডার্ন স্কুলে(বালক বিভাগ) একটি সাময়িক স্বাস্থ্য ক্লিনিকের উদ্বোধন হবে। প্রতি শনি ও রবিবার সন্ধ্যায় মনরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা উপস্থিত থাকবেন ওই কেন্দ্রে। চিকিৎসা প্রার্থী দুঃস্থ পরিবারের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিতে পারেন আপনারা। পত্রে যোগাযোগের ঠিকানা—সৃজনী,প্রযত্নে – অমল সোম, পি ২৩ এ কিম্বার স্ট্রীট, কলি-১৬।

কাঁচড়াপাড়া বিজ্ঞান দরবার সংস্থা গত ৩১শে অক্টোবর এবং ১লা নভেম্বর দু'দিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানের বিষয়সূচীতে ছিল বিজ্ঞান পদযাত্রা, মডেল প্রদর্শনী, স্লাইড সহযোগে বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পথসভা ইত্যাদি। এদের বলতে চাওয়া কথাগুলো পোষ্টার শ্লোগানের মধ্যেই ফুটে উঠেছিল। যেমন, কুসংস্কার দূর কর, বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তুলুন, কারখানার ময়লা ফেলে গঙ্গার জল দূষিত করা চলবে না, বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করা চলবে না ইত্যাদি। শেষ দিন কাঁচরাপাড়া মণ্ডল বাজারে একটি পথসভা হয়।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র জুলাই-আগস্ট ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত "হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত" এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে মতামত জানিয়ে গোটাকয়েক চিঠি আমাদের দপ্তরে এসেছে। স্থানাভাবে চিঠিগুলি এ সংখ্যায় দেওয়া গেল না। চিঠিগুলি পরে প্রকাশিত হবে।

—সঃ মঃ, বি-ও-বি

Registration No. R. N. 34929/79 "Registered" Postal Regi. No. WB/CC 113

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র পত্রিকাগুলি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদও বিজ্ঞান বিষয়ে দুটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এইসঙ্গে স্নাতক ও স্নানকোত্তর পর্যায়ের পুস্তক প্রকাশনার কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে। প্রকাশিত পুস্তকাবলীর কয়েকটি নাম নীচে দেওয়া হ'ল।

ভূবিদ্যা

ভারতের শিলাস্তর ও ভূতত্ত্বীয় ইতিহাস	ডঃ তিরিরঞ্জন সর্ব্বাধিকারী	১৬·০০	পুরাজীববিদ্যা	ডঃ শুভেন্দু কুমার বক্সী	১৯·০০
			প্রযুক্তি সম্পর্কীয় ভূবিদ্যা	পতাকীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৩·০০
কৃষ্টালমূর্তিবিদ্যা ও আলোক্রান্ত			আধুনিক প্রস্তরবিদ্যা	ডঃ অনিরুদ্ধ দে	১২·০০
মিনারল বিজ্ঞান	সন্তোষ রায়	১৮·০০	ভারতের খনিজ সম্পদ	দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১২·০০
গঠনসম্পর্কীয় ভূবিদ্যা	ডঃ সুবীর কুমার ঘোষ	১৯·০০	ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা	সঙ্কর্ষণ রায়	১২·০০

শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসাশাস্ত্র

পরিপাক, বিপাক ও পুষ্টি	দেবজ্যোতি দাস	৩০·০০	শারীরবিদ্যা ও শারীরতত্ত্ব	ডঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র	৮·০০

রাশিবিজ্ঞান

রাশিবিজ্ঞানের পরিভাষা	বিশ্বনাথ দাস ভাগবত দাসগুপ্ত অরিজিৎ চৌধুরী	১·৫০	রাশিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব (১ম খণ্ড)	শৈলেশভূষণ চৌধুরী অরিজিৎ চৌধুরী বিশ্বনাথ দাস	১৬·০০
রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগপদ্ধতি	ডঃ ব্রজেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা ভাগবত দাসগুপ্ত ডঃ বাসুদেব অধিকারী	১৭·০০	রাশিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব (২য় খণ্ড)	শৈলেশভূষণ চৌধুরী অরিজিৎ চৌধুরী বিশ্বনাথ দাস	১৬·০০

আরো অন্যান্য বই এর জন্য যোগাযোগ করুন

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০ ০১৩

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেসের পক্ষে রূপলেখা ২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।